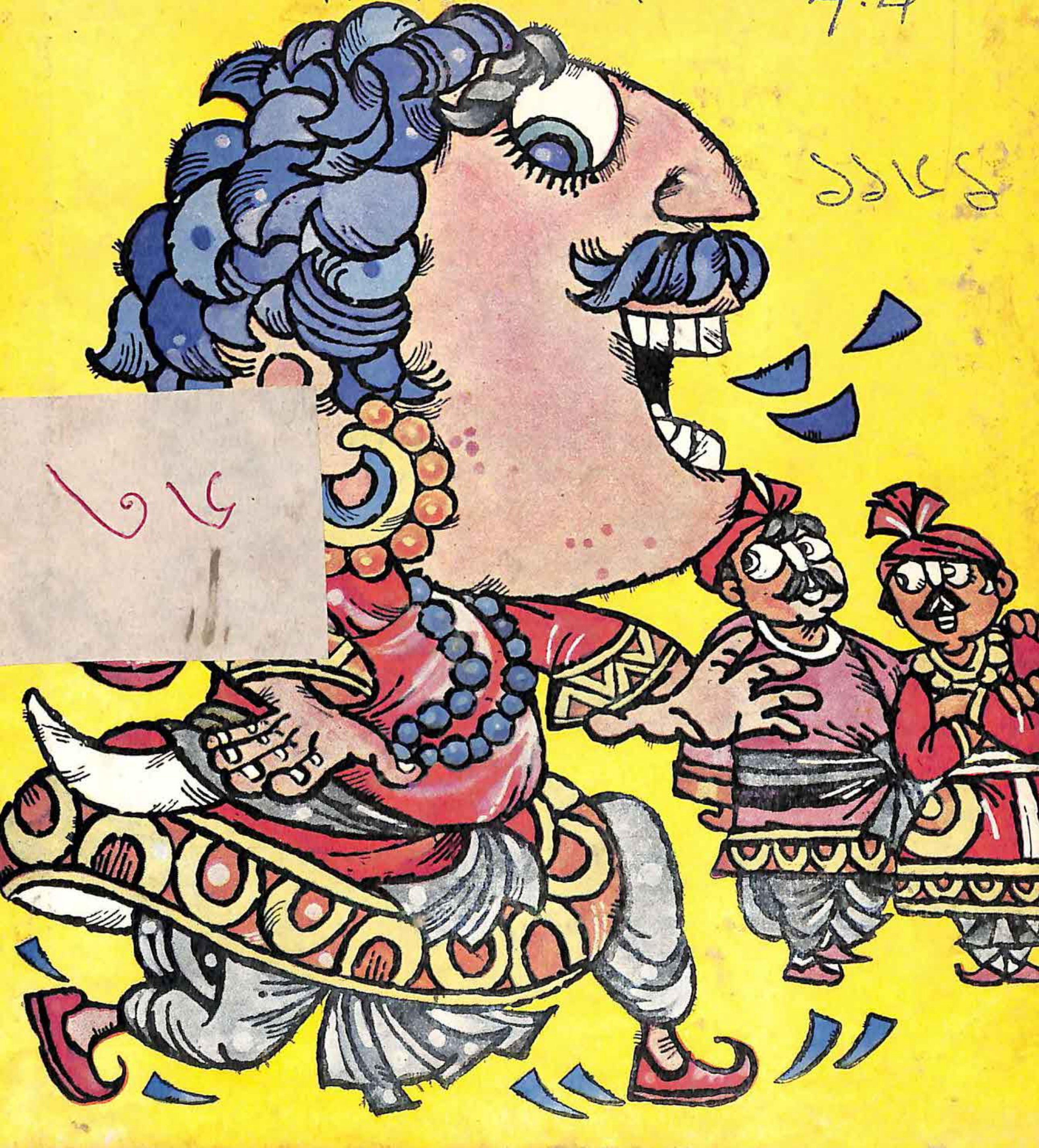
রাজার মুকুট

ইন্দিরা দেবী







রাজার মুকুট

ইন্দিরা দেবী

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ □
জানুয়ারী, ১৯৮৫
মাঘ ১৩৯১
দ্বিতীয় মুদ্রণ □
অক্টোবর ১৯৮৯
আশ্বিন ১৩৯৬
তৃতীয় মুদ্রণ □
ডিসেম্বর, ১৯৮৯
অগ্রহায়ণ ১৩৯৬

প্রকাশনা □
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩



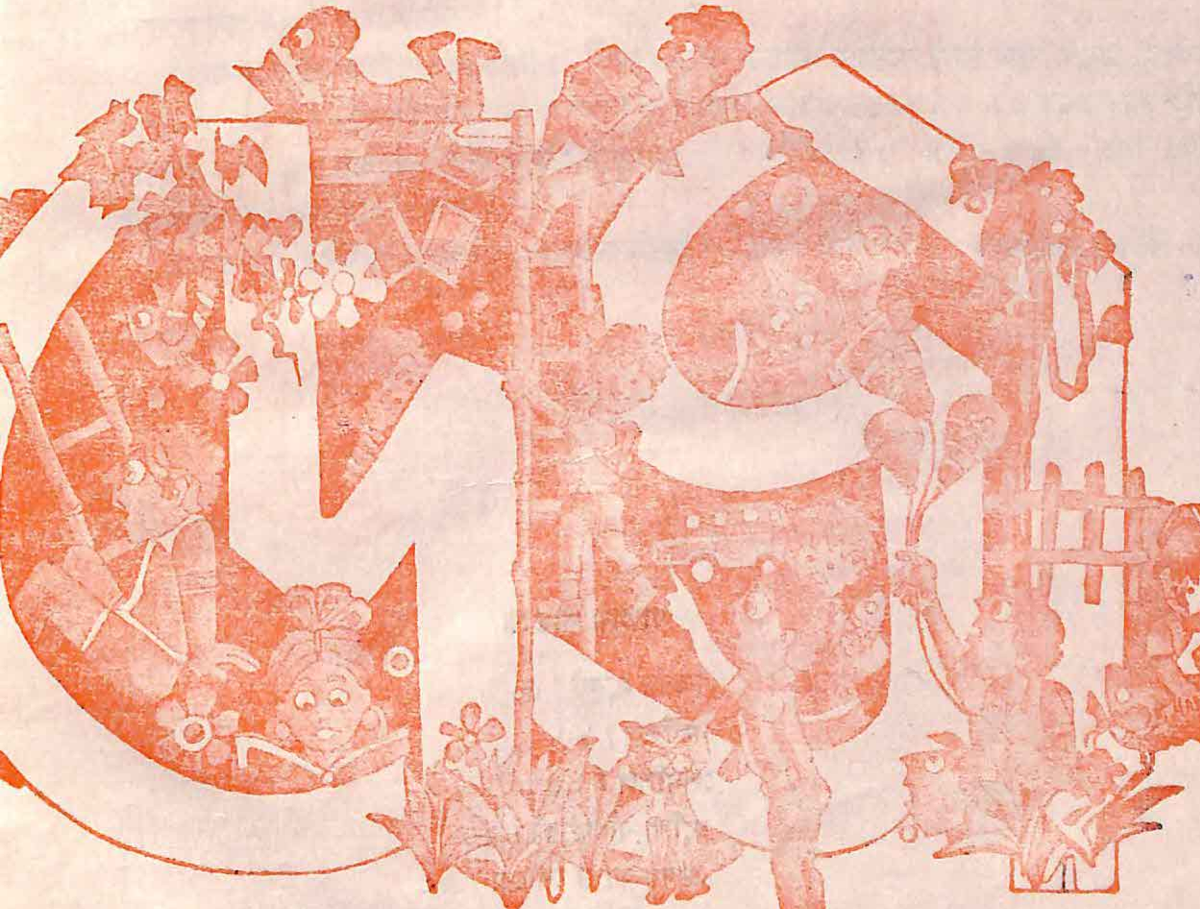
মুদ্রণ □
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬



প্রচ্ছদ ও অলংকরণ □
শ্রীধীরেন শাসমল

দাম ঃ কাগজে বাঁধাই □ ছয় টাকা
~~বোর্ড বাঁধাই □ আট টাকা~~

ঝিনকি, রিনকি
আর
সম্রাটকে
—ইন্দিরাদি





পাতায় পাতায়

রাজার মুকুট



রাজার মুকুট হারিয়েছে! কী কাণ্ড, রাজার মুকুট—সে তো যে সে কথা নয়; সেই মুকুট হারালে তো কারুর প্রাণ থাকবে না।

হলেই বা খেলাঘরের পুতুল রাজা! রাজার মুকুট হারালে রাজাকে রাজা বলে মনেই হবে না। আবার মুকুটে কত রকমারী পাথর মুক্তা বসান। সেইসব পাথর এত চকচকে এত জ্বল জ্বল করে যে সেদিকে চোখ রাখা যায় না—আর রাজার মুকুট সে তো দামী হবেই! এমনি মুকুট—গেল হারিয়ে, সকলেরই ভয়ে প্রাণ ধুক ধুক করছে!

রাজার তো একখানা মুকুট নয়—দু'খানা মুকুট। রাজা একটা পরেন শীতকালে, একটা গরম-



কালে। গরমকালের মুকুটেও অনেক কাজ করা। পাথর বসানো—তবে হাল্কা। আর শীতকালের মুকুট যেমন ভারী তেমনি কাজ করা। দুটোই খুব দামী।

গরমকাল—রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মাথার মুকুট খুলে একটা গাছের কাছে রেখে আবার বেড়াচ্ছিলেন, মাথাটা হাল্কা হলো, রাজাও আরাম বোধ করলেন। বাগান থেকেই বাড়ী ফিরে অন্দর মহলে গেছেন, তাই আর মুকুটের কথা মনে নেই। খোঁজ পড়লো পরের দিন সকালে যখন রাজসভায় যাবেন পোষাক পরে মুকুট মাথায় দিতে গিয়ে দেখা গেল মুকুট নেই।

খোঁজ খোঁজ রব চারদিকে। রাজা খোঁজেন, রাণী খোঁজেন, অন্দর মহলের লোকজন, দাস দাসী যে যেখানে ছিল সবাই খোঁজে, শেষ পর্যন্ত বার মহলেও খবর যায়—সেখানেও হুলস্থুল পড়ে যায় মুকুট খোঁজার—কিন্তু বাড়ী-ঘর তোলপাড় হয়ে গেল, রাজার মুকুট কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে কি হবে, কি হবে, এই ভয়ে সব যখন অস্থির তখন রাণী সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মুকুট খুলে আপনি কোথায় রেখেছিলেন মহারাজ ?

রাজা একটু ভেবে বল্লেন ঃ মুকুট আমি পরেছি দুপুরে সভায়, তারপর বিকেলে মাথা ধরেছিল, বাগানে বেড়াতে গেলাম—হ্যাঁ মনে হয়েছে, বাগানে রেখেছিলাম।

রাণী বল্লেন ঃ তাই বলুন মহারাজ, আপনি কাল যখন অন্দর মহলে এসেছেন তখন তো মাথায় মুকুট ছিল না।

রাজা বল্লেন ঃ ডাকতে বলো পাত্র মিত্রকে—সবাইকে বলো, আমি বাগানে বেড়াতে গিয়ে বাহারী ঝাউ গাছের কাছে মুকুট রেখেছিলাম। মুকুট এখনি খোঁজ করুক, নাহলে রাজসভায় যাওয়া হবে না।

রাণী বল্লেন ঃ মহারাজের তো আর একটা মুকুট আছে। ওরা খোঁজাখুঁজি করুক—ততক্ষণ আপনি অন্যটা মাথায় দিয়ে রাজসভায় যান।

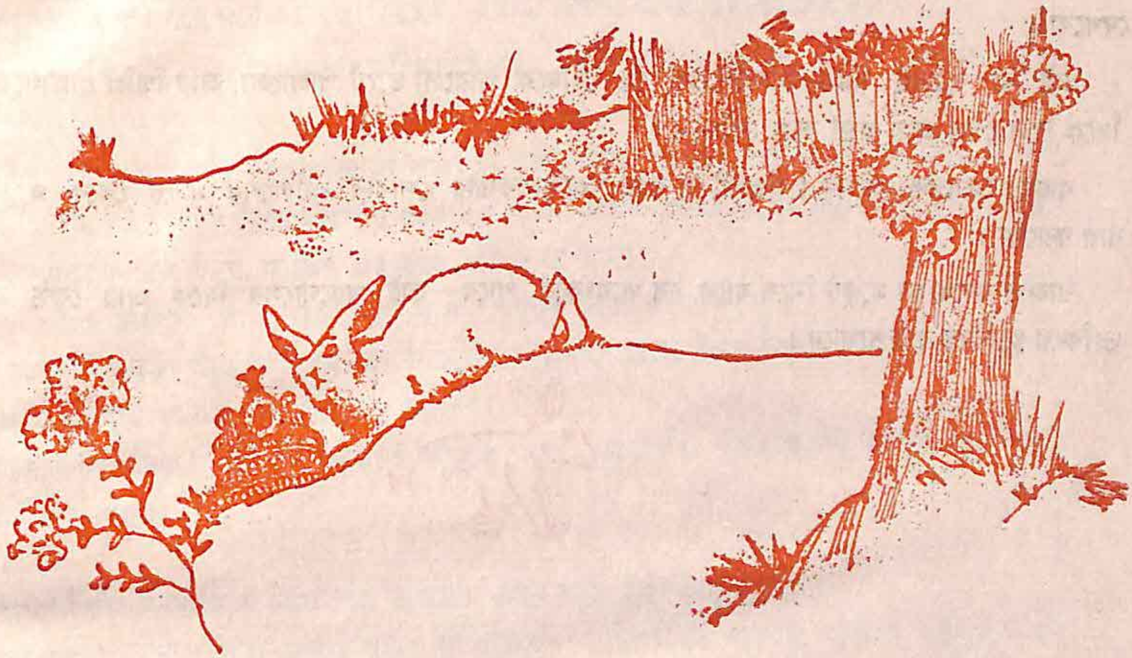
রাজা বল্লেন ঃ পাগল হয়েছ, শীতকালের মুকুট—এই গরমকালে পরবে কে ? আমাদের বংশে এ নিয়ম নেই। তাতে সভা যদি দু'দিন বন্ধ থাকে—তা থাকবে।

রাণী আর কিছু কথা বল্লেন না। খোঁজাখুঁজি হতে লাগলো, কিন্তু কোথাও মুকুট পাওয়া গেল না। যেখানে রাজা বসেছিলেন সেখানে বাগানের আশে পাশে, এমনকি সারা বাগান তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো—কোথাও মুকুট নেই।

কেউ সন্ধান দিতে পারলো না—সবাই ভয়ে অস্থির। রাজার মুকুট নিয়ে বাড়ী বসে থাকবে এ সাহস কার, তা কেউ ভেবে পেল না। দু'দিন পরে রাজা আবার বেড়াতে গেছেন বাগানে। রাজার সঙ্গী বল্লে, দেখুন মহারাজ আমার মনে হয় এ আর কারুর কাজ নয় তুলোর খরগোসটা নিশ্চয় এ কাজ করেছে।

—কি করে বুঝলে ? রাজা বল্লেন।

—এ ছাড়া আর কে, নেবে? সেদিন যা বৃষ্টি পড়েছে, তাছাড়া সাপ ব্যাঙ যা কিছু জন্তু জানোয়ার বাগানে আছে তারা যদি নিতো বাগানেই পাওয়া যেতো, কিন্তু খরগোস তো তা করবে না।



এমন তাড়াতাড়ি মাটি কেটে চলে যায় যে তার নাগাল পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় খরগোসের বাড়ীটা তল্লাসী করে দেখা যাক!

রাজা বল্লেন ঃ বেশ তাই পাঠাও তাহলে।

তখনি ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাগানের বড় ঝাঁকড়ামাথা গাছটার নীচে দিয়ে একটা গর্ত্ত দেখা গেল— সেইটা দিয়ে দু'জন পেয়াদা সোজা চলে গেল।

উঃ, কী তাড়াতাড়ি খরগোসটা মাটি কেটে কেটে নিজের বাড়ীর রাস্তা করেছে, ভারী চতুর তো!

অনেকখানি গিয়ে তারা খরগোসের বাড়ী পেঁছিল। খরগোসকর্ত্তা তখন গিন্নি আর ছেলেমেয়ে নিয়ে চায়ের টেবিলে চা খাচ্ছে, খাবার নিয়ে ছেলেমেয়েরা কাড়াকাড়ি করছে আর খরগোসগিন্নি ধমক দিচ্ছে।

চায়ের টেবিলে চা খাবার খেতে ব্যস্ত আর সেখানে কিনা দু'জন অচেনা লোক এসে উপস্থিত।

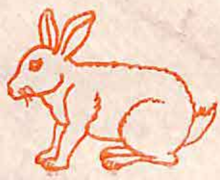
খরগোসগিন্নি উঠে দাঁড়াল, ছেলেমেয়েরা গোলমাল থামিয়ে ফেল্লো আর খরগোসকর্ত্তা ব্যাপার বুঝতে পেরে চোখ পিট-পিট করে বল্লে ঃ কি চাই আপনাদের ?

তারা বল্লে ঃ রাজার মুকুট হারিয়েছে, আমরা খুঁজতে এসেছি। আমরা এ বাড়ীর সব জায়গা দেখবো।

এই না শুনেই বাচ্চা-কাচ্চাগুলো যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো, আর গিন্নি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল আর কর্ত্তা বল্লে, খুঁজুন।

রাজার লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে খরগোসকর্তার শোবার বালিশের নীচে থেকে মুকুট বার করলো।

রাজার কাছে যে মুকুট নিয়ে যাবে, সে পুরস্কার পাবে—তাই খরগোসের দিকে আর কেউ না তাকিয়ে ছুটলো রাজপ্রাসাদে।



ওরা চলে গেলে খরগোসগিন্নি বল্লে, বলেছিলাম ওসব এনো না, শুনলে না। বল্লে, কি সুন্দর দেখতে দেখ, এটা যদি বাড়ীতে থাকে জাত ভাইদের কাছে কদর বেড়ে যাবে। নাও ঠেলা এখন—বলি হয়েছে তো ?

খরগোসকর্ত্তা মুখ কাঁচু মাচু করে বল্লে ঃ কে জানে বাবা রাজার মুকুট, একটা ভাল জিনিস দেখেছিলাম, নিয়ে এসেছিলাম—অত কাণ্ড কে জানে।

এখন বোঝ, কত কি কাণ্ড ঘটে দেখ।

হলোও তাই। দুদিন বাদে রাজার পেয়াদা এসে খরগোসকর্ত্তাকে ধরে নিয়ে গেল।

রাজসভায় রাজা বিচারে বসেছেন, মাথায় সেই মুকুট। মুকুটের পাথরের আলোয় রাজার চারদিক ঝলমল করছে। পাত্র মিত্র নিয়ে রাজা সভায় বিচার করছেন।

—কি হে খরগোস, আমার মুকুট চুরি করেছিলে কেন ?

খরগোস চুপ।

—চুপ করে আছ যে, উত্তর দাও।

—আমি বুঝতে পারিনি মহারাজ ওটা আপনার মুকুট।

—বুঝতে পারনি ? খিঁচিয়ে উঠলো রাজার পেয়াদারা। রাজাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার অবসর না দিয়ে ওরা বল্লে, আদেশ করুন মহারাজ ওকে নিয়ে যাই, দিই ফাঁসি কাঠে। রাজা ফাঁসি ভালবাসেন না। তাঁর ইচ্ছে পাতালে নির্ব্বাসন, তার মানে মাটির নীচে চালান করে দেওয়া। জব্দ হবে, কিছুদিন বাদে কষ্ট পেয়ে মরেও যেতে পারে। রাজার শাস্তি হলো এই সবচেয়ে বড়।

রাজা কোনদিক না ভেবে বল্লেন ঃ ফাঁসিকাঠে নয়। দাও বেটাকে মাটির নীচে পাঠিয়ে—চুরি করার শাস্তি বুঝুক।

পেয়াদারা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। রাজা একি আদেশ দিলেন—ওতো ওর ভালই হলো। মাটির নীচে ওকে নিয়ে যাবারও দরকার হবে না, এখনি ছেড়ে দিলেই নতুন পথ কেটে নিয়ে ও কত তাড়াতাড়ি চলে যাবে, কাজেই ওর এতে শাস্তি হলো না।

রাজা ধমকে উঠলেন—যাও, যাও, নিয়ে যাও—একটুও দেরী করো না।

পেয়াদারা কি করে আর, খরগোসটাকে নিয়ে গিয়ে বাগানে ছেড়ে দিয়ে বল্লে, তোরই মজা হলো, রাজা যেমন সকলকে শাস্তি দেন তোকেও দিলেন।

খরগোস কোনদিক না চেয়ে তখন মাটি খুঁড়তে সুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পথ করে নিয়ে মিলিয়ে গেল।

খরগোসগিন্নি গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছে—এমন সময় কর্ত্তা এসে হাজির।

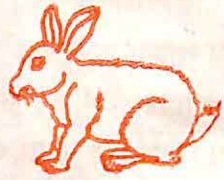
কর্ত্তা বল্লে ঃ শোন গিন্নি আমার শাপে বর হয়েছে—মাটির নীচে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে—এই আমার শাস্তি। রাজা একটুও ভাবেননি মাটির নীচে আমরা ভালই থাকবো।

গিন্নি হাত জোড় করে নমস্কার করে বল্লে, ভগবান আছেন, নাহলে শুধু শুধু তোমার এমন হয়। তুমি ত জানতে না ওটা রাজার মুকুট—কিন্তু তবুও পরের জিনিসে লোভ করেছিলে বলে এত কষ্ট পেলে, হয়রানি হলো। মনে নেই মা বলতেন, পরের জিনিসে লোভ করতে নেই। নাক কান মলে খরগোস বল্লে ঃ না জেনে করেছি, আর কখনও এমন কাজ করবো না।





মজলিস



চাঁদের আলো ঝলমল করছে—রাত তখন খুব বেশী হয়নি। খাঁচার জানলা দিয়ে আকাশ আর বাগানের দিকে চেয়ে চেয়ে বিকির এত ভালো লাগলো—মনে হলো কি হবে মিছিমিছি ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়ে—তার চেয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। শোবার ঘরের একটু জানলা দিয়ে যেন আনন্দটা উপভোগ করা যায় না।

ছোট বিকি, সাদা তুলোর সুন্দর গোলগাল চেহারা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। জোরালো আলো লাগলে চোখের ঝুটো মতিগুলো কেমন চিকমিকিয়ে ওঠে—

ওমা! তাইতো, বিকিকে তাতো বলা হয় নি। বিকি তো লালটুর পুতুল গিনিপিগ। লালটু তার জন্য কম করে নাকি! বিকির থাকার জায়গা যদি দেখো অবাক হয়ে যাবে থাকার জায়গাটি কেমন পরিষ্কার আর খড়কুটোর বিছানাও বেশ আরামের।

কিন্তু আকাশে চাঁদের আলো—আর বাগানে ফুলের মিষ্টি গন্ধে সে রাতে বিকির আর ঘুম এলো না—তাই এদিক ওদিক চেয়ে বাগানের ভিতরের পথটি ধরে চলতে সুরু করলো।

—সত্যি কি সুন্দর রাতটা! বিকি ভাবলো একজন যদি সঙ্গে কাউকে পাওয়া যেত—আজকের খেলাধুলোটাও ভাল হতো!

বিকি ভাবছে আর চলছে!

হঠাৎ একটা ঝোপের ভিতর থেকে আওয়াজ এলো কে হে ওখানে ? কে যায় ?

বিকি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না—আবার চলতে সুরু করলে।

—সাড়া দাও না কেন ? এমন ধারা জানোয়ার তো আর দেখিনি—বক্তা এবার সামনে এলো।

—ওঃ তাই বলো কাটবেড়ালীদাদা, তুমি এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করছিলে ? আমি বিকি গো বিকি, দেখতে পাচ্ছ না ? লালটুর বিকি।

—না, না বাপু, আমি তোমায় দেখেছি বা নাম শুনেছি বলে তো মনে করতে পাচ্ছি না। লালটু? ওঃ, ঐ ওদের বাড়ীর দুষ্টু ছেলেটা?

- না না কাঠবেড়ালীদাদা, লালটু খুব ভালো তা ছাড়া সে আমার বন্ধু যে!

—ওঃ তাই নাকি! তা বেশ, তাহলে তো বন্ধুর কথা শুনে রাগ হচ্ছে?

না না রাগ কেন হবে। আজকের রাত্তিরটা বেশ না কাঠবেড়ালীদাদা? কেমন আলো বলত, যেন দিন হয়ে গেছে। আমি খেলাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চাঁদের আলোয় বিকির চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠলো।

কাঠবিড়ালী বল্লেঃ হ্যাঁ ভালই রাত, এত আলো ঝোপে ঝাড়ে পড়েছে যে আমার ঘুম আসছে না, তাই তো তোমায় দেখতে পেলাম। আরে, তুমি যে বেড়াতে এসেছ তোমার ল্যাজটা কোথায় রেখে এলে?

—ল্যাজ? বিকি অবাক হয়ে তাকাল—ল্যাজ? আমার ল্যাজ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আচ্ছা বোকা গিনিপিগ তো, বলি তোমার ল্যাজটা আবার কোথায় রেখে এলে? ধমক দিয়ে উঠলো কাঠবেড়ালী।

- তাইতো! তাইতো! ল্যাজ, ল্যাজটা আবার—

বাধা দিয়ে কাঠবেড়ালী বল্লে—তাইতো কি আবার, ল্যাজটার কথা মনেই নেই! আশ্চর্য্য তো!

কাঠবেড়ালীর ডোরাটানা জমকালো ল্যাজটার দিকে চেয়ে চেয়ে বিকি আবার বলে উঠলো —তাইতো!

—কি তাইতো তাইতো করছো শুনি, নিজের ল্যাজের কথা খেয়াল থাকে না? খিঁচিয়ে উঠলো কাঠবেড়ালী, আর নিজের মোটা সোটা ল্যাজটা উঁচু দিকে তুলে বেশ বাবু হয়ে বসে পড়লো।

—সত্যি কি সুন্দর ল্যাজটা – মনে মনে ভাবলো বিকি!

—বলি ভাবছো কি? ল্যাজটা যে কোথায় ফেল্লে - তার একটু খোঁজ করতে যেতে হবে না?

—হ্যাঁ তাইতো ভাবছি – বিকি আবার কাঠবেড়ালীর ল্যাজের দিকে তাকালো।

—বসে বসে না ভেবে চলো আমার সঙ্গে, খোঁজ করে দেখিগে ল্যাজটা গেল কোথায়?

বিকি বল্লেঃ হ্যাঁ তাই চলো কাঠবেড়ালীদাদা, সত্যি ল্যাজটা যে কোথায় গেল।

চাঁদের আলোয় বাগানের সরু পায়ে চলা পথটা ধরে কাঠবেড়ালী আর বিকি চলতে লাগলো।

—কি গো মাসী, মনে করেছ সকাল হয়ে গেছে? তা হয়নি, এ হলো চাঁদের আলো—ফুটফুট করছে চারিদিক, তুমি সকাল হয়েছে মনে করে দুর্গা নাম করে বিছানা ছেড়ে এসেছ?

মোটা সোটা রাজহাঁসগিন্নি প্যাঁক প্যাঁক করে বলে উঠলো ঃ কে জানে বাবা, বয়স হলে রাতে ঘুম কমে যায়—তা ও তোমার সঙ্গে কে গা ?

কাঠবেড়ালী বল্লে ঃ ও হলো বিকি, লালটুর তুলোর গিনিপিগ—ওর জন্যই তো এত রাতে বেরিয়েছি, বেচারী ওর ল্যাজটি হারিয়েছে।

—ওঃ হরি, সে আবার কি কথা, ল্যাজ হরিয়ে ফেল্লে ?

—হ্যাঁ তাই তো হয়েছে, এখন কি করা যায় বলতো মাসী ?

তাই তো ভাবছি, আচ্ছা চলো বাঘার কাছে যাই, ও অনেক খবরাখবর রাখে। কুকুর জাত, ইঁদুর টিঁদুরের ল্যাজের সঙ্গে যদি গিয়ে থাকে—সে খবর টবর বাঘাই পাবে। ও হলো এ চত্বরের খবরের কাগজ—বুঝলে ?



—বেশ তাই চলো—।

তিনজনে বাঘার ঘরের কাছে এসে উপস্থিত হলো। বাঘার চোখে ত আজ ঘুম নেই—সেও নেমেছে খেলাঘর থেকে। ওদের দেখে ঘোঁ ঘোঁ করে অভ্যর্থনা জানালো – আরে এসো মাসী, এসো কাঠবেড়ালী কি খবর ? ওটা আবার কে পেছনে পিট পিট করছে।

— ওর জন্যই তো আসা। সমবেত কণ্ঠে বল্লে উঠলো হাঁসগিন্নি আর কাঠবেড়ালী।

—ও হলো বিকি, লালটুদের বাড়ীর খেলাঘরে থাকে—বেচারীর ল্যাজটি হারিয়েছে, কি করা যায় ওর জন্য ? তুমি কি দেখেছ কোথাও ?

—আমি ? নাঃ, মনে করতে পারি না। তবে ধেড়ে ইঁদুরের একটা ল্যাজ আমি যোগাড় করে দিতে পারি, চাও তুমি ? কি নাম হে তোমার ?



আমার নাম বিকি ! ধন্যবাদ ! আমার ইঁদুরের ল্যাজ নিয়ে দরকার নেই, যদি কাঠবেড়ালী দাদা, মাসী কিম্বা তোমার মত হতো—তাহলে নিতাম।

—ও হো তোমার যদি একেবারে এই রকম পছন্দ হয় তাহলে তো আমি তোমায় কোনও সাহায্যই করতে পারবো না।

—আহা কি যে বলো বাঘা, তুমি এমন চালাক হয়েও পারো নাকি, কোনো রকমে বিকির

হারানো ল্যাজটা পাওয়া যায় কিনা দেখতে ? পারলে তুমিই পারবে তা আমরা জানি—কাঠবেড়ালী নরম স্বরে বলে উঠলো।

বাঘা একটু ভাবলো, তারপর বল্লে ঃ আচ্ছা চলো দেখি—ঐ যে টুবলুর খেলাঘরের কুঁড়েখানায় বুড়ী ঠাকুমা থাকে ওর কাছে অনেক খোঁজ খবর পাওয়া যায় ওর কুয়োতে কত জিনিস যে ওঠে জল তুলতে গিয়ে - যদি বিকির ল্যাজটা ওর ভিতরই গিয়ে থাকে।

—তাহলে তাই চলো।

সকলে মিলে বুড়ী ঠাকুমার বাড়ী উপস্থিত। বুড়ী তখন বসে বসে সেলাই করছে। চোখে ঘুম নেই।

—আরে সকলে মিলে দল বেঁধে কি মনে করে ?

—হ্যাঁ আমরা তোমার কাছেই এসেছি—তুমি যদি দয়া করে তোমার কুয়োটা একটু দেখ—বিকির ল্যাজটা ওর ভিতর পড়েছে কি না !

—বিকির ল্যাজ ? বুড়ী চশমার ভিতর দিয়ে চোখ উঁচু করে দেখতে লাগলো বিকিকে !

বিকি লজ্জা ভয়ে জড়সড় হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেল্লে।

বুড়ী বল্লে ঃ তা দেখতে শুনতে তো ভালই দেখছি। আচ্ছা আমি দেখবো - এখনই যেতে হবে তো ? বেশ ! আমি কিন্তু কাজের পারিশ্রমিক চাই,—হাঁসগিন্নি তুমি আমায় এককুড়ি ডিম দেবে, আর কাঠবেড়ালী তোমাকে কিছু বাদাম জোগাড় করে দিতে হবে—আর বাঘা তুমি ভাই আমার বাড়ীটা পাহারা দেবে যতক্ষণ না কাজ সারা হয়—বাচ্চা বিকির জন্য যখন এতই করেছ এটুকুও করতে হবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।

হাঁসগিন্নি ফিসফিস করে কি বল্লে ঃ ঠাকুমা বুড়ীর ওটা ম্যাজিক কুয়ো কথা বল্লে—জিনিস হারালে পাওয়া যায়—জানিস তো ?

কাঠবেড়ালী বাধা দিয়ে বল্লে ঃ ঐ শোন না কি বলছে।

— তুমি শুনছো তো ? বিকির ল্যাজটা কোথায় এনে দাও তো !

তারপর দড়ি বেঁধে বুড়ী বালতি নামিয়ে দিল কুয়োর ভিতর।

জল তুলে আস্তে আস্তে ঢাললে বুড়ী। তারপর বালতির ভিতর হাত দিয়ে খুঁজলো—কই কিছুই নেই তো !

—কি আশ্চর্য্য, কিছুই তো নেই। বুড়ী আবার বালতি নামালো—আবার জল ঢাললো আবার, বালতি হাতড়ালো—কিছুই নেই—কি আশ্চর্য্য !

মুখ গম্ভীর করে বুড়ী এসে নিজে কুঁড়ে ঘরে ঢুকলো—যেখানে সবাই বসে আছে গোল হয়ে। বুড়ীর চেহারা দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেছে তার উপর যখন ভারী গলায় চেঁচিয়ে ডাকলো ঃ চাঁদ! চাঁদ!

চাঁদ যার নাম সে যখন এলো তার চেহারা দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। কালো কুৎসিত একটা হোঁৎকা কাঠের বেড়াল—বুড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

এর নাম চাঁদ? তিনজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। বিকি যেন হতভম্ব হয়ে গেছে।

বুড়ী বল্লে ঃ এই যে একে দেখছ ওর ল্যাজ হারিয়ে গেছে—কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কি কুয়োতে বালতি নামিয়েও পাইনি দেখ তুমি পাও কি না।

কাঠের হোঁৎকা বেড়ালটা একটু ভেবে বল্লে ঃ ওর ল্যাজ তো হারায় নি?

—হারায়নি! চেঁচিয়ে উঠলো বুড়ী—আর ওদের দলটা আশ্চর্য্য হয়ে তাকালো বেড়ালটার দিকে।

- না হারায়নি—বেশ জোর দিয়ে বল্লে হোঁৎকা বেড়ালটা।

—কি যে বলছো তুমি তার চেয়ে চলো খুঁজে দেখি।

— খুঁজে দেখতে চাও চলো—কিন্তু ওহে ছোকরা এদিকে এসো তো।

বিকি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো।

চাঁদ তাকে ভাল করে দেখে, আকাশ ফাটান হাসি হেসে উঠলো, সে হাসি শুনে সবাই চমকে উঠলো।

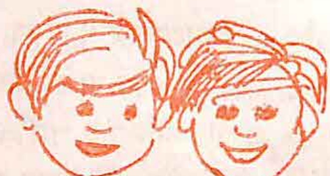
—হাসছো কেন?

—আরে হোঃ হোঃ—কি কাণ্ড—এর কি ল্যাজ ছিল যে হারাবে? এ কি ধরনের তামাসা —হোঃ হোঃ।

বেড়ালটার হাসি আর থামে না।

খেলাঘরে বিকি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। খেলাঘরেও তাহলে স্বপ্ন আছে? তাই রক্ষে!

পেনসিল



জামাটা শেষ হলো। সেলাই মেসিন বন্ধ করে পিটার দর্জ্জি উঠে দাঁড়ালো। গিন্নি বল্লে ঃ বাঃ চমৎকার হয়েছে তো! এটা কার অর্ডার ছিল?

পিটার বল্লে ঃ এটা রাজামশাই-এর জন্য তৈরী করেছি, আমি নিয়ে যাই। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও।

অনেক রাত্রি তখন। তা নাহলে তো পুতুলদের ঘুম ভাঙ্গবে না কাজও আরম্ভ হবে না। আমাদের কাজ দিনে আর ওদের হলো রাত্তিরে। সন্ধ্যাবেলা ওদের সকাল হয়।

তাই পুতুলদের দেশে এখন কাজের তাড়া। মেয়েরা ঘরকন্নার কাজে আর ছেলেরা বাইরের কাজে।

পিটারের জামা পেয়ে পুতুল রাজা ভারী খুশী। জামা এমন সুন্দর গায়ে ফিট করেছে – মনে হচ্ছে পরিয়ে কাটা হয়েছে। রাজার তাই খুশীর অন্ত নেই। জামাটা অন্দর মহলে রাণীর কাছে পাঠালেন। তারপর তাঁর কাছাকাছি যারা ছিল সকলকেই দেখালেন আর খুশী হয়ে নিজের সোনার পেনসিল পিটারকে দিয়ে দিলেন।

পিটারও বাড়ী এসে গিন্নিকে সেটা দেখিয়ে বল্লে ঃ জামা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে তাই রাজামশাই তাঁকে পুরস্কার দিয়েছেন।

পিটার গিন্নির খুব আনন্দ। কর্ত্তা পুরস্কার নিয়ে এসেছে তাই আনন্দ হবারই কথা। তাই ভালো করে দেখে শুনে বল্লে ঃ এমন ভাবে রেখে দাও যেন নষ্ট না হয়, আর তোমার যা ভুলো মন, কি যে কোথায় রাখো ঠিক নেই—তাই আরো বলছি।

পিটার বল্লে ঃ ঠিক বলেছ, কোথায় রাখি বলতো? পকেটে রাখবো?

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো গিন্নি ঃ কাঁচি রেখে একটা জামার পকেটও আস্ত আছে নাকি? সব তো ফুটো, পেনসিলটা সেখানে রাখবে কি হারাবার জন্যে?

মুখ কাঁচুমাচু করে পিটার বল্লে ঃ তাহলে কোটের পকেটে রাখি ?

—তা আর রাখবে না, হারাতে হবেতো ! অনবরত কোট বদলাচ্ছো, কোথায় কোনটা রাখছো ঠিক নেই, আমি কেবল গুছিয়ে মরি, না না ওসব করো না, কোটে রেখে কাজ নেই।

—তবে ঐ জানলার উপরে যেখানে কাগজপত্র থাকে ঐখানে রাখি ?

ব্যস্ত হয়ে গিন্নি বল্লো না, না—ওখানে ছেলে মেয়েরা অনবরত ঘাঁটছে হাত দিচ্ছে কাজেই ওখানে রেখে কাজ নেই।

পিটার মহা চিন্তায় পড়েছে—বল্লে ঃ তবে কোথায় রাখবো ?

গিন্নি একটু ভেবে বল্লে ঃ এক কাজ করো, পেনসিলটা সুতো দিয়ে বেঁধে কানে গুঁজে রাখো।

পিটারও খুশী হয়ে বল্লে ঃ ঠিক বলেছ, হারাবার ভয় থাকবে না তাহলে।

গিন্নি বল্লে ঃ যা বল্লাম তাই করো, আমি এখন রান্নাঘরে যাচ্ছি।

পিটার একে ভালমানুষ তার উপর মনটাও ভুলো—তাই গিন্নির কথামতই কাজ করলে—কি দরকার বাবা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে।

যে যার কাজে গিয়ে বসলো। পিটার একমনে সেলাই করে যাচ্ছে। তখন তার এক বোন আর ভাই বেড়াতে এলো। বোন বল্লে ঃ পাড়ার সবাই বলছে রাজা মশাই নাকি তোমায় সোনার পেনসিল উপহার দিয়েছেন ? সকলে দেখতে আসবে আমিও এলাম—কই দেখাও না দাদা, কেমন পেনসিল ?

—ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ পেনসিল তো ? দেখাচ্ছি দাঁড়াও—এই বলে পিটার টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, পকেটে হাত দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কিন্তু পকেটে পেনসিল নেই।

— তাইতো ! তাইতো ! পেনসিলটা কোথায় রাখলাম তোতলামী করে পিটার বলে উঠলো।

বোন বল্লে ঃ কোথায় রেখেছ খোঁজ ভালো করে, সোনার পেনসিল, যে সে কথা তো নয়।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, খুঁজতে হবেই—এই বলে পিটার এদিক ওদিক টেবিল আলমারী সব খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কোথায় পেনসিল —কোথাও নেই।

বিব্রত হয়ে পড়লো পিটার—তারপর ভাবলে এটা নিশ্চয় বাচ্চুর কাজ। ছোট ছেলে বাচ্চু আদর পেয়ে পেয়ে একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে—গিন্নি তো বোঝে না। পিটার বাচ্চু, বাচ্চু করে চীৎকার করে ডাকলো—কিন্তু কোথায় বাচ্চু ? সে বাড়ীতেই নেই, কোথায় খেলতে গেছে। আর কি যে মুস্কিল—পিটার ভাবলে !

বোন ভাইয়ের অবস্থা দেখে বল্লে ঃ তুমি বোসো দাদা, আমি বৌদিকে ডাকি দেখি সে জানে কিনা।

—আরে না, না, সে জানে না শুনলেই এখনি বকাবকি সুরু করবে ব্যস্ত হয়ে পিটার বল্লে।

একটু ভেবে পিটার আবার বোনকে বল্লে ঃ এক কাজ করতো ভাই, ক্ষান্তপিসীর বাড়ী চলে যা, ও তো সব কি মন্তর তন্তর জানে, বাটি চালে না কি সব করে—ও সব ঠিক করে দেবে। যাদু টাদু

করে—ক্ষান্তপিসী সব বার করে দেবে, আর যদি তোর বৌদিকে ডাকতে যাস তাহলে রেগে যাবে চেঁচামেচি বাধাবে। তুই ভাই চলে যা লক্ষ্মীটি।

পিটার গিন্নির ভয়েই বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বোনও দাদার কথা শুনে তাড়াতাড়ি চললো ক্ষান্তপিসীর কাছে। ক্ষান্তপিসী হলো অনেক দিন আগের মাটির ধেবড়া পুতুল, অনেক পুরানো বলে রং চটে গেছে, কানের সারি মাকড়ীর অর্দ্ধেকগুলো হারিয়েছে। দিনের বেলা ছেলে মেয়েরা



খেলাঘরে এসে তাকে নিয়ে এমন করে যে তার এ অবস্থা না হয়ে উপায় আছে। পিটার দর্জ্জির বোন কিন্তু নীল চোখ, গাউন পরা, লালচে গাল, বড় কাঁচের পুতুল। ওরকম চেহারার পুতুল আজকাল বাজারে নেই। তার পোষাকও সুন্দর—ফিটফাট বাবুলাট হয়ে থাকে সে।

ক্ষান্তপিসীকে ডাকতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব খেলাঘরের পুতুলরা এসে উপস্থিত—কি পেনসিল পেয়েছে পিটার দেখতেই হবে। ব্যাপার দেখে পিটার ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে।

বোন কিন্তু ক্ষান্তপিসীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। গিন্নি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে লোক-জনের বহর দেখে ঘোমটা টেনে দিল। ক্ষান্তপিসী তার কাজ সুরু করে দিয়েছে—এই বাটি মন্তর পড়ে ছাড়বো, যার কাছে গিয়ে আটকে যাবে তার কাছেই আছে। এখনও যদি কেউ দিয়ে দিতে চাও যে নিয়েছ—দিয়ে দিতে পারো। ক্ষাতপিসীর এ ঘোষণায় ফল হলো না, যারা দেখতে এসেছিল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল—কারণ চোর না ধরা পড়লে তো পেনসিল দেখা হবে না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ক্ষান্তপিসী মন্তর পড়লো আর অমনি বাটি চলতে সুরু করলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখছে, এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে বাটিটা কেমন এগিয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু একি হলো? বাটিটা অন্য কারুর কাছে গেল না, সোজা গিয়ে পিটারের পায়ের কাছে আটকে গেল। সবাই অবাক!

পিটার মাথা চুলকাচ্ছে আর বলছে ঃ আমার কাছে পেনসিল নেই, তা যদি থাকবে তাহলে তো বোনকে দেখাতে পারতাম। এ মিথ্যা যাদু, এ হয় না—যত সব বাজে ব্যাপার।

ক্ষান্তপিসী ধমকে উঠলো ঃ আমি এই কাজ করে বুড়ো হয়ে গেলাম—আর তুমি বলছো নেই। শীগ্‌গীর বার করো কথায় আছে।

চারদিকে সোরগোল এ আবার কি, নিজের জিনিস নিজে রেখে—বলছে নেই।

বাটিও নড়ছে না, ক্ষান্তপিসীর বকুনীও থামছে না - আর পিটার বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে, পেনসিল বার করছে না। গিন্নি আর থাকতে পারলে না। রাগে দুঃখে—লজ্জা আর রইলো না—ছুটে এসে পিটারকে ধরে সজোরে দু'চার বার ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে ঃ তোমায় না বলেছিলাম ভালো করে রাখতে।

ওমা! বলতে বলতে পিটারের কান থেকে ঝপ্‌ করে পেনসিলটা মাটিতে পড়লো। আর বাটিও ঘুরে ক্ষান্তপিসীর দিকে চলতে সুরু করলো।

ক্ষান্তপিসী সগর্জ্জনে বললে ঃ বলিনি, আমার মন্তর মিথ্যে হবার নয়।

পিটারের অবস্থা দেখে বোনের মমতা হলো। বল্লে ঃ দাদার বড্ড ভুলো মন কিনা।

ঘোমটার ভিতর থেকে গিন্নি বলে উঠলো ঃ যেমন আমার পোড়া কপাল!

এদিকে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। আর কথাবার্ত্তা নেই। যেদিকে যে পারলো ছুটে নিজেদের জায়গায় চলে গেল।



বুদ্ধি বলিহারি



তুলতুলির খেলাঘর থেকে রাগ করে পাঁচ ছটা পুতুল পালিয়ে গেল। তাদের মধ্যে তুলোর ঘোড়া, লালচে রংএর ভাল্লুক, চিকচিকে চোখ খোরগোস, হলদে আর কালো রং মেশা কুকুর আর কালো কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা।

ওখানে ওরা আর থাকবে না তাই পরামর্শ করে বাইরে এলো। ওরা একটা বাড়ী তৈরী করবে। কাজেই কুচ্ছিত কাফ্রি পুতুল তার ডোরাটানা হাওয়াই সার্টের পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বার করে বাড়ীর নক্সা আঁকতে সুরু করে দিল। কিন্তু অন্য পুতুলগুলো বাড়ী তৈরী করতে সুরু করে দিয়েছে।

ভাল্লুক বল্লে, তুমি তো বেশ ফাঁকি দিচ্ছ হে, কই আমরা খেটে মরছি তুমি দিব্যি মজা করে ছবি আঁকছ ?

—ছবি ? বলো কি হে, তার কি সময় আছে আমার ? বাড়ীটার মাপজোপ করতে হবে, একটা প্ল্যান করতে হবে যেখানে সেখানে যা তা হলে তো চলবে না।—কাফ্রী পুতুল উত্তর দিল।

কাফ্রীর আসল মতলব বুঝতে পেরে ভাল্লুক হা হা শব্দে হেসে উঠলো। অন্য সব পুতুলরা ছুটে এসে বল্লে—কি হলো হে ভাল্লুক ভায়া ?

—আরে কিছু না, কিছু না—চল দেখি কাজ কতদূর এগিয়েছে। ওদের চলে যাবার পথের দিকে চোখ তুলে দেখলো কাফ্রী পুতুল। তারপর আবার কাজে মন দিল।

কাফ্রী পুতুল ফাঁকি দিলেও অন্য সকলের যত্নে বাড়ী বেশ সুন্দর তৈরী হয়ে গেল। দোতলা বাড়ী, বেশ অনেকগুলো জানলা দরজা, নীচের তলার ঘরের কোলে চমৎকার বারান্দা। এখানে বসে চা খাওয়া হবে আর গল্পগুজব হবে পুতুলদের, খেলাধুলোও হতে পারে। উপরের তলায় শোবার ঘর বড় একটা, ছোট একটা, তার কোলে রেলিং ঘেরা বারান্দা।

কাফ্রী পুতুল বড্ড একলা থাকতে ভালবাসে—কাউকে দেখতে পারে না, এদের সঙ্গে থাকতে হবে বলেই যা মুখে মুখে একটু বন্ধুত্ব রেখেছে।

বাড়ী তৈরীর পর কাফ্রী পুতুল কিন্তু ঠিক করে আছে ওপরের ছোট ঘরখানা একলাই সে দখল করবে কিন্তু সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে তো !

তাই সেদিন যখন সবাই বিকেলে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরলো, সেই বারান্দায় চেয়ারে আর ইজিচেয়ারে

বসে চা খেয়ে সব গল্প করছে আর সন্ধ্যেবেলা খবর নিয়ে দৈনিক খবরের কাগজ বেরিয়েছে সেটা নিয়ে কাফ্রী পুতুল একটু আলাদা হয়ে বসে পড়েছে। পড়ছে না মনে মনে মতলব আঁটছে কে জানে!

—নাঃ বড্ডই যেন নিঝুম লাগছে—এই বলে ভাল্লুক রেডিওটা খুলে দিল।

রেডিওতে তখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হচ্ছিল।

কাফ্রী পুতুলটা রেগে গরগরিয়ে উঠলো।

ভাল্লুক বল্লে ঃ কি হয়েছে কি তোমার?

—কি হয়েছে তা কি ভাবছো তোমরা? রেডিওটা খুলে দিলে বেশ!

কি হয়েছে তাই বলো!

—মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে খুলে পড়ে যাবে এখনি, আর তোমাদের যেমন গোলমাল তেমনি রেডিওর চেঁচামেচি।

কাফ্রী তখনও গজ গজ করছে, এখানে নাকি শান্ত হয়ে বসা যায়, না কাগজ পড়া যায়—কেবল গোলমাল।

খরগোস বল্লে ঃ তুমি বড্ড গোলমেলে মাসী। চুপ করে গান শোন তো!

কাফ্রী পুতুল সে কথা শুনলো না। একটু পরে সিঁড়ির দরজা খুলে দুপদাপ করে উপরে উঠে গেল।

আবার একটু পরে ওপর থেকেই চেঁচিয়ে বল্লে ঃ আমার মাথার যন্ত্রণার জন্য এখনি এক কাপ গরম চা আদা দিয়ে খাবো, কেটলী কই, জল গরম করবো কিসে?

নীচে থেকে খরগোস বল্লে ঃ গ্যাস জ্বালো—ওখানেই কেটলী আছে।

ঘোড়া বল্লে ঃ চা খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোও দেখি ঠাণ্ডা হয়ে।

কাফ্রী পুতুল রাগ দেখিয়ে কি করে আলাদা ঘরখানা দখল করবে তারই মতলব করছে মনে মনে। ভাল্লুক একগোছা বেলুন কিনে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল—একটা একটা করে কাফ্রী তাকে ফাটাতে আরম্ভ করলো।

—শব্দ হচ্ছে কিসের?—ভাল্লুক চেঁচিয়ে বলে।

—ও কিছু নয়। এই বলে উপরের বারান্দায় বালতী করা যে জল ছিল হুড়হুড় করে ঢেলে দিল। জলের ধারা নীচে এসে সব ভিজিয়ে দিল। খরগোস উপরে উঠতে গিয়ে দেখে সিঁড়ির দরজা বন্ধ।

ঘোড়া বল্লে ঃ তুমি কি আরম্ভ করছো বলো তো, নীচে যতক্ষণ ছিলে বিরক্ত করেছো, ওপরে গিয়ে আবার জ্বালাচ্ছো কেন? কাগজখানা একটু পড়ছি তাও দেবে না? আচ্ছো লোক তো তুমি?

কাফ্রী পুতুল তখন একগোছা ঝাঁটা নিয়ে জল ফেলতে সুরু করেছে! ছিটিয়ে ছিটিয়ে ফেলছে আর সেগুলো এসে লাগছে নীচের তলায়।

সকলে মিলে চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে ঃ কি করছো কি ? ভয়ানক বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।
কোনও উত্তর দিল না কাফ্রী পুতুল, এমন কি খরগোসের ঠেলাঠেলিতেও দরজা খুললো না।
খানিক বাদে দুমদাম করে নামলো কাফ্রী পুতুল।
খরগোস চোখ পিটপিটিয়ে বল্লে ঃ তুমি মাসী বড় রাগী।
যাঃ যাঃ পুচকে ছেলে, কথা বলছে দেখ না বুড়োর মত।



পুতুলের উপর। সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল—তাই খাওয়া-দাওয়ার পর যখন সবাই উপরে উঠে দেখলো—বড় লম্বা ঘরে এক একটা খাটে সকলের আলাদা বিছানা হয়েছে—আর কাফ্রী পুতুল আলাদা ছোট ঘরে বিছানা করেছে তখন সকলে অসন্তুষ্ট না হয়ে খুশীই হলো কারণ ওরা ওর সঙ্গ চাইছিল না।

মজা হলো কাফ্রী পুতুলের। প্রথম দিন রাগ আর চেঁচামেচি করে সে দিব্যি একটা ঘর দখল করে নিল—আর সেইটাতেই সে বেশ কায়েমী হয়ে বসলো।

চালাকী করলেও, তার পর থেকে আর সে ঝগড়া করে নি। এখন অকারণে তার মাথাও ধরে না, রেডিওর গানও খারাপ লাগে না।

এদের কাণ্ড শোনো



কেয়ার পুতুলরাণীর যে অত রাগ তা আগে কে জানতো বলো ? বাবাঃ আমি শুনিওনি, দেখিওনি অত রাগ ! পুতুলরাণী খেলার বাক্সে নরম বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। বেলা হয়ে যায়—চা খাবার সময় চলে যায়, তবু পুতুলরাণীর ঘুম ভাঙে না। কেয়াও পুতুলরাণীকে কিচ্ছু বলে না।

কেয়া হোলো বাড়ীর একটি মেয়ে—তাই খুব আদর তার! তার সঙ্গী হোলো ঐ চব্বিশ টাকা দামের সেলুলয়েডের ডল ; যেটা বাপি জন্মদিনে এনে দিয়েছিলেন। আর ভুলো বাবার আদরের সাদা বড় লোমওয়ালা কুকুর আর মায়ের মানুষ করা সাদা ও বাদামী রং মিশোনো মোটা-সোটা মেনী। মেনী মায়ের আদরে দিন দিন ফুলে উঠছে। মাঝে মাঝে ভুলোরও হিংসে হয়। বাড়ীর কর্তা যদিও ভুলোকে ভালবাসেন—কিন্তু সকাল ১০টা থেকে রাত্তির ৭টা অবধি তো কর্তা বাড়ী থাকেন না চাকর-বাকররা খাবার দেয়, চান করায়—কিন্তু হতচ্ছাড়া চাকরগুলো একটুও যত্ন করে না। সেদিন এতো বেলা হোয়ে গিয়েছিলো, খাবার না পেয়ে ভুলো ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লে। চাকরগুলো পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছে আর ওর যে খাওয়া হয়নি তা তাদের গ্রাহ্যই নেই। সেদিন ভাগ্যি গিন্নি মা ডেকে বল্লেন ঃ ও বামুনঠাকুর, ভুলোর মাংস ভাত দিয়েছো ? তখন তাদের মনে হোলো। হরিয়া চাকরটা কম পাজী! বসে বসে খেয়ে, পান চিবুতে চিবুতে তখন খাবার দেবার সময় হোলো। খেয়ে দেয়ে—বৈঠকখানার কার্পেটে গিয়ে শুয়ে পড়ে ভুলো ভাবছিল ঃ মেনীটা কি সুখেই আছে। বাড়ীর ভিতর গিন্নি মায়ের সঙ্গে ঘোরে। ওর জন্যে দুধ মাছ আলাদা। আর ওর চাকরদের হাতে। কেবল রবিবার কর্তা যেদিন বাড়ী থাকেন, সেদিন তাঁর কাছে চান করা, খাবার খাওয়া, সবই হয়। সপ্তাহে এই একটি দিনই যা ভুলোর ভালো দিন। মেনী খুব অহঙ্কারী। একে সে অন্তঃপুরে থাকে গিন্নীর বিছানায় ঘুমোয়, ভালো খায় দায়—গিন্নীর আদর তো আছেই। কেয়ার মা যখন আলতা-পরা পা নিয়ে ঘোরাফেরা করেন মেনী লাল টুকটুকে পায়ের ওপর আছড়ে আছড়ে খেলা করে।

আর পুতুলরাণী ? সে তো যেন রাজকন্যে। বাবাঃ এতো ঐশ্বর্য্য যে আছে, তা কেয়ার পুতুল-

রাণীকে দেখলে বোঝা যায়। তিনি তো বাড়ীর সর্বেসর্বা। বাড়ীর সবাই যখন চায়ের টেবিলে যায় পুতুলরাণীর জন্যেও ছোট একটা কাঠের চেয়ার আছে। ঝলমলে গয়না আর পোষাক পরে পুতুলরাণী সেখানে এসে বসে। কেয়ারা যখন বেড়াতে যায়, তার কোলে বা ঘাড়ের উপর চড়ে পুতুলরাণীও চল্লেন। অবিশ্যি বেড়াতে গেলে কর্তার সঙ্গে ভুলোও যেতে পায়—কেবল এ-সুখ মেনীর ভাগ্যে নেই। আজকের ব্যাপার কিন্তু অন্য—শোন কি হয়েছে। পুতুলরাণী ঘুমোচ্ছিল—চা খেতে বসে কেয়া অনেকবার পুতুলরাণীকে ডাকল, সাড়া নেই। তখন মেনী আর ভুলোকে বল্লে, যাও তো পুতুলরাণীকে ডেকে আনো। ভুলো দৌড়োলো, মেনীও নিজের গোঁফ দুবার কুঁচকে নিয়ে গম্ভীর চালে চলতে লাগলো!

বিছানার কাছে গিয়ে ভুলো বল্লে—ও পুতুলরাণী! ওঠোনা, তোমার যে ঘুম ভাঙেই না, কেয়াদিদি যে ডাকছে। শুনছো ও পুতুলরাণী, পুতুলরাণী গো! শুনছো, ওঠো, চোখ মেলো।

মেনী বল্লে—দেখ ভুলো, সকাল বেলায় ক্যার ক্যার করে চেঁচাসনি, সরে যা আমি ডাকছি!

ভুলো তো ক্ষেপেই অস্থির। সে বল্লো—আহা কি সুন্দর মিষ্টি আওয়াজ গলার, ম্যাও ম্যাও আর মিউ মিউ। ডাকনা কি করে ডাকবি, সুর করে গান গেয়ে ডাকবি? তাহলে বল আমি রেডিওর প্লাগটা লাগিয়ে দিই—তোর ঐ ম্যাও ম্যাও আর মিউ মিউ শোনবার ইচ্ছে নেই আমার।

মেনী বল্লে—দেখ ভুলো, সকালবেলাই রাগিয়ে দিসনি ঝগড়ু কোথাকার! যা এখান থেকে আমি পুতুলরাণীকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

ভুলো উত্তর দেয় আমার কেয়াদিদি বলেছে ডেকে নিয়ে যেতে, আমায় বাবু চা বিস্কুট যা দিয়েছিল, তা না খেয়েই আমি পুতুলরাণীকে ডাকতে এসেছি।

মেনী বল্লে—তোকে বলেছে না আমায় বলেছে—আমি ডাকবো!

ভুলো বল্লে—দেখবি তবে? পুতুলরাণী ও পুতুলরাণী! তাকাবেও না, উঠবেও নাতো? তবে চলো! এই বলে ভুলো পুতুলকে মুখে করে নিয়ে চলল।

মেনী বিস্ময়ে অবাক—ওমা! ওমা! তুই পুতুলরাণীকে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছিস কি বলে? এই হতচ্ছাড়া ভুলো।

ভুলো যখন পুতুলরাণীকে মুখে করে কেয়ার কাছে আনলো সবাই তো অবাক। বাবা ভুলোকে আর একখানা বিস্কুট মাখন লাগিয়ে দিয়ে বল্লেন বেটা তোর বুদ্ধি তো খুব, নে যা! ভুলো চোখ বুজে বাবার কাছে দু'বার ঘুরে নিয়ে আদরটা উপভোগ করলো! কেয়া পুতুলকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো। আর পুতুলরাণী তখন? একেবারে ভীষণ রেগে গেছে। পাজী ভুলোটা আমার সকালবেলার মিষ্টি ঘুম ভাঙিয়ে দিলো, আবার মুখে করে আনা, ঐ বিচ্ছিরি দাঁত, আমার সিল্কের কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হয়ে যাবে! আরামে ঘুমোচ্ছি—ভারি দরদ দেখানো হলো।

মেনীও সমর্থন করলো—পাজী ভুলো, ভারী কাজ দেখানো হচ্ছে কেয়ার কাছে, সুখ্যাতি নেবার মতলব। কেউ দেখতে পারে না কিনা!

ভুলো উত্তর দিলো—তবু যদি তোর একটু বিস্কুটও জুটতো। যা, যা এখান থেকে! বেশ করেছি পুতুলরাণীকে এনেছি!

পুতুলরাণী বল্লে—বেশ করেছি এনেছি, ভারী আবদার হয়ে গেছে—কেন তুই আমাকে মুখে করে আনবি—?

ভুলো গম্ভীর হয়ে বল্লে—নিশ্চয়ই আনবো, কেন কেয়াদি বল্লে—নিয়ে এসো—মুখে করে এনেছি, যদি গড়াতে গড়াতে আনতুম!

পুতুলরাণী হুঙ্কার দিয়ে উঠলো এনে দেখালি না কেন?

মেনী বল্লে যা বলেছ পুতুলরাণী—কথার ছিরি দেখ।

ভুলো ফোঁস করে উঠলো—কেয়াদি বলেছে আমি করবো, বেশী সর্দারী করিসনি মেনী।

—সাধে কি বলে কুকুর—পাত কুড়িয়ে খাওয়া অভ্যাস, বুঝবে কি ভদ্রতার। মেনীর গোঁফ ফুলে উঠলো।

পুতুলরাণী সরে গিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বল্লে—যত সব নোংরামো। কেয়াকে বলে দূর করে দেবো। যেমন মেনী তেমনি ভুলো। কেউ কম নয়।

—আর তুমি তো কেবল সেজেগুজে শুয়ে থাকতে জানো? কোনও কাজের নয়।

বলতে বলতে মেনীর মোটা সাদা লেজটা ফুলে উঠলো।

মা বাবাকে বল্লেন—মেনী ভুলোতে কেবল ঝগড়া—তবু যদি একসঙ্গে থাকতো।

কেয়া ওদের দিকে চেয়ে একবার হাসলো।

—দেখছিস ভুলোদাদা, পুতুলরাণীর অহঙ্কার? মেনী বলে উঠলো।

—হবে নাই বা কেন, তোদের মত তো কেউ নয়—সরে যা, আজ কেয়াকে বলবো আমার জামা কাপড়ে কিছু সুগন্ধি দিয়ে দেবে—পুতুলরাণী অহঙ্কারের সুরে বল্লে।

বুঝলে মেনীদিদি ওকে জব্দ করতেই হবে। ভুলো বল্লে।

—নিশ্চয়ই! শোনো ভুলোদাদা আজকের রাতে আমার ওখানে তোমার নেমতন্ন।

তারপর আর একটু সরে হেসে কি যেন বলে দু'জন দু'দিকে চলে গেল।

রাত্রে মেনীর বাড়ী ভর-পেট খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে ভুলো সারা বাড়ীটা ঘুরে নিলে। সবাই শুয়ে পড়েছে—কেবল সদর দরজায় দারোয়ানজী একটা ছোট আলোর নীচে বসে সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে।

খানিকবাদে ভুলো দৌড়ে একবার বাইরে চলে গেল, পিছনে পিছনে মেনী।

সকালে চায়ের টেবিলে কেয়া যখন ভুলোকে বল্লে পুতুলরাণীকে নিয়ে আয়। ঠিক সেই সময় হরিয়া পুতুলরাণীকে এনে হাজির। সিল্কের পোষাক ছেঁড়া, কাদামাখা—আর নাকটা যেন কে কামড়ে দিয়েছে, খেঁদা হয়ে গেছে! হরিয়া বল্লে—বাজার যেতে যেতে দেখলাম রাস্তা পার হয়ে ওদিকে ফুটপাতে হাইড্রেনের পাশে জলকাদার ওপরে পুতুলরাণী পড়ে আছে।

ওমা সেকি! কেয়া চেঁচিয়ে উঠল।

হুলো আর মেনী দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সরে পড়লো।


যাঁ
ঘটেছিল

ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল বেধে গেছে, খাটের নীচে রুমকুর খেলাঘরে।

মায়ের শোবার ঘরে মস্ত খাট, সেখানে মা আর রুমকু ভাই বোনরা সব ঘুমোয়। এই ঘরে খাটের তলায় সংসার পাতা হয়েছে। পেতল, মাটি, প্লাষ্টিক ও কাঁচের নানা রকমের হাঁড়ীকুড়ী, কড়া, ডেকচী, থালা, বাটি, চায়ের কাপ, টিপট সব রকম সাজানো গোছানো তকতক ঝকঝক করছে। আবার অন্য দিকে নানা সাজে নানা রকম পুতুল জন্তু জানোয়ার বসে আছে। রুমকুর খেলাঘর ছোটখাট ঐকটি সহর যেন।

আমরা সারাদিনের শেষে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ি আর পুতুলরা বা পুতুলের জন্তু-জানোয়াররা দিনভোর যে ভাবে সাজিয়ে রাখবে সেই ভাবে সেজে গুজে বসে ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দেবে। রাত্তিরে যেই দশটা বাজলো—বাড়ীর লোকেরা খাওয়া দাওয়া কাজ কর্ম সেরে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। তখন হাই তুলে তুলে পুতুলরা জন্তু-জানোয়াররা এক এক করে জেগে উঠতে লাগলো। মুখ ধোয়া চায়ের টেবিলে বসে চা খাওয়া, খবরের কাগজ পড়া এইসব চলবে যথানিয়মে। এদের খবরের কাগজের খবর নিজেদের কথাতেই ভর্তি। রুমকু কাকে ভাল বাসে, কোন পুতুলটা পুরোনো হয়ে গেছে ধুলো পড়ছে তার দিকে তাকায় না ছোঁয় না। তা ছাড়া ওর যে আদরের কুকুর রোভার—তার যত দোষ হোক তা রমকু দেখতে পায় না। তারপর খেলাঘরের আরো যেসব ঘটনা ঘটছে। কবে খেলাঘরের লরী চালাতে গিয়ে—দম দেওয়া পপি কুকুর ছানাটার একটা পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। তার কান্নায় সব্বাই ছুটে এলো, পপিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হলো—এইসব।

রুমকুর খেলাঘর ছাড়াও ঐ যে জ্যান্ত কুকুরবাচ্চা ছিল, আসল বিলাতী কুকুর, তার নাম রোভার। রোভারের উপর খেলাঘরের প্রাণীদের খুব রাগ। এদের ধারণা রুমকু রোভারকে পেলে তাদের চায় না। সেদিন রুমকু খেলাঘরে যখন সবাইকে নিয়ে খেলা করছে এমন সময় কোথায় ছিল রোভার—ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাজা পুতুলের মুকুট ছিটকে গেল···রান্নাঘরে গিয়ে পড়লো খরগোস আর বাচ্চা হরিণ, ভাগ্যি লাগেনি গরম তেল—তাহলে রক্ষে ছিল! সোনালি চুল ডলটার সিল্কের জামা কাপড় নষ্ট হয়ে গেল জল লেগে এইসব হলো কিন্তু রুমকু একটা কথাও বল্লে না রোভারকে। কেবল বল্লে, রোভার তুমি লক্ষ্মী হয়ে বসো—দেখছ না খেলা করছি। রোভার যে তাদের হাড়ে গোড়ে ব্যথা ধরিয়ে দিল তার খোঁজ নেই। এরকম ঘটনা রোজই একটা না একটা ঘটে। এইজন্য পুতুলদের মধ্যে ঠিক হয়েছে রোভারকে জব্দ করতে হবে। রুমকু যখন আর একটু ছোট ছিল তখন যেখানে বেড়াতে যেত সোনালি চুল, চোখবোঁজা পুতুল সেজেগুজে চুলে রিবন বেঁধে ওর সঙ্গে যেত। মা আবার রুমকুর জামা থেকে কাপড় বাঁচিয়ে সোনালি চুল পুতুলের ফ্রক রিবন তৈরী করে দিতেন। রুমকুর সঙ্গে এক রকম পোষাকে সেজে সেও যেত বেড়াতে। সেই সোনালি চুল পুতুলকেও রুমকু আজকাল নিয়ে যায় না। মা নাকি বলেছেন, তুমি এখন বড় হয়েছ। বেশ তো, তাই বলে রোভারই বা সঙ্গে যাবে কেন? তার আদরের সীমা নেই। খাবার সময় থাকবে, বেড়াতে যাবার সময় থাকবে, সমস্ত সময়ই

কেবল রোভার। রোভারও তেমনি, খেলাঘরের লোকগুলোকে যেন দেখতে পারে না। সেইজন্যই তো সবার রাগ।

রাজাপুতুল সেদিন বল্লে, এর ব্যবস্থা হচ্ছে ওকে জব্দ করা—তোমরা কি বল ?

সবাই সমবেত ভাবে বলে উঠলো ঃ নিশ্চয়ই! বিচার একটা চাই বৈকি! কিন্তু জব্দ করা যাবে কি করে ?



রাজাপুতুল তোবড়ানো মুকুটটা দু'হাতে ঘুরিয়ে বল্লে, দেখ কি অবস্থা করেছে এর।

মোটকা হাতী একপাশ থেকে বল্লে ঃ আমায় দেবেন স্যার, আমি পায়ের চাপে ওটা সিধে করে দেবো।

ব্যাঙ থপথপ করে লাফিয়ে বল্লে ঃ নিশ্চয়! নিশ্চয়! হাতী ভায়া থাকতে আর ওটুকু হবে না ?

জিরাফ তার সরু লম্বা গলাটা বাড়িয়ে বল্লে ঃ ওসব তো তুচ্ছ ব্যাপার ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু রোভারের কি ব্যবস্থা হচ্ছে সেটাই জানা দরকার আগে।

রাজপুতুল বল্লে ঃ তোমরা কি বল সেটাই আগে শোনা যাক—তারপর ভেবে দেখি।

কাঠের ঘোড়াটার পায়ের কাছে খরগোস পিটপিট করে তাকাচ্ছিল—এবার সে মুখটা উঁচু করে বল্লে ঃ যাই করা হোক একটু বেশী যেন জব্দ হয়—আমার বড্ড লেগেছে।

ঘোড়া বল্লে ঃ সে যা ঠিক হবে তাই হবে, কার কম লেগেছে কার বেশী লেগেছে তা নিয়ে কথা হচ্ছে না।

সোনালি চুল পুতুল বল্লে ঃ কবে যে রুমকুর সময় হবে আমার জামা কাপড় ছাড়াতে। দেখেছ কি ময়লা হয়ে গেছে ?

রাজাপুতুল বল্লে ঃ তোমাদের কি ইচ্ছা ? ওকে কষে মার দেওয়া ? কিম্বা একেবারে সাবাড় করে দেওয়া—কিম্বা হাত পা ভেঙ্গে জখম করা ?



—শেষেরটা হলেই ভাল হয়ঃ সমবেত গলায় সবাই বল্লে।

—কিন্তু যা করবে তার আগে ভাবা উচিত—ঘাড় নাড়া বুড়ো পুতুল হাতের হুঁকোয় একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে।

প্লাষ্টিকের বিছেটা নড়েচড়ে বল্লেঃ যদি আমি একটা কামড় দিই—তাহলে যাদুর আর রক্ষে নেই।

— কেন আমি ? মাটির থেবড়া লাল চোখ কাঁকড়া তার শুঁড় দুটো বার করে এগিয়ে এলো।

ঘোড়া বল্লেঃ কি করা যাবে তা রাজামশাই বলবেন। রাজা কপাল কুঁচকে অনেক ভাবলেন—কি করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না।

মনোরমা বৌ পুতুল ফিস্ ফিস্ করে বল্লেঃ এসব আবার কেন ডেকে একটু বকে দিলেই তো ভাল হয়।

তুমি ওসব বোঝ না চুপ কর - সেপাই পুতুলটা খটাস্ করে বন্দুকটা রাখলে আর বল্লে।

মনোরমা বৌ আবার বল্লেঃ তোমরা না পারো আমি রোভারকে বলবো। আমার শাশুড়ী বলতেন—হিংসে করতে নেই হিংসে করে যা করবে তাতেই খারাপ হবে।

খরগোস একটা লাফ দিয়ে এসে বল্লেঃ কি যে বল মাসী!

—না, তোরা সেদিনকার বাচ্চা শুনবি কেন বল ? আমার শাশুড়ী বলতেন—ছোট বড় কোনও প্রাণীকে হিংসে করো না। রোভারকে রুমকু ভালবাসে তাই তোমাদের হিংসে—এই তো ?

মনোরমা বৌ-এর ভাল কথা কেউ শুনলো না। অনেক কথাবার্তার পর ঠিক হলো কাঁকড়া আর বিছেকে যা হয় করতে বলো। এই ঠিক হলো, যে রাত্রে ওরা ঘুমুলে কাঁকড়া আর বিছে গিয়ে রোভারকে কামড়ে ধরবে, এমন কামড়াবে যাতে তার খুব লাগে—তবে অন্য ক্ষতি না হয়।

মনোরমা বৌ পুতুল উঠে বল্লেঃ এসব ভাল নয়, আমি ওর মধ্যে নেই।

অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে সেদিন রাত্রে রুমকুর খাটের নীচে রোভার যেখানে শুয়েছিল কাঁকড়া ও বিছে সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

তারপর কি হয়েছে জানি না কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রুমকুর ছোটদা খাট থেকে নেমে বাইরে গেল—আবার একটু পরে এসে খাটের উপর শুতে যাবার সময় কেবল বল্লেঃ আঃ কি মড় মড় করে। পায়ের কাছে রাজ্যের খেলনা রুমকুর—কালই এখান থেকে খেলাঘর তুলতে বলবো।

সকাল বেলা খেলাঘরের প্রাণীরা আশ্চর্য হয়ে দেখলো, রোভার খেলা করছে আর খাটের কাছে প্লাষ্টিকের বিছেটা দু'খানা আর মাটির কাঁকড়াটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে আছে।

সকলেই তাদের জন্য খুব দুঃখ পেল—হয়তো রাত্রে আবার সভা বসবে।

কেবল মনোরমা বৌ পুতুল অসহ্য হয়ে দিনের আলোতেও কথা বলে উঠলো। হবে না ওরকম! পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।



টুনটুনি



যদিও সে একটা নানা রঙ মেশানো সুন্দর পাখী, আওয়াজটাও তার আরও মিষ্টি। কোন দেশী পাখী কি জাত কিছুই জানা যায়নি। কিন্তু অলক ওর নাম দিয়েছিল টুনটুনি। পাখীটার পরিচয় জানা নেই তার কারণ অলক তো ওকে দোকান থেকে কিনে আনেনি বা মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েও গাছ থেকে বা বন-বাদাড় থেকে পায় নি। একদিন সকালে অলক ঘুম থেকে উঠে যখন স্কুলের পড়া করছে—হঠাৎ দেখলে টেবিলের পাশের জানলাটা যেটা দিয়ে অলক পড়তে পড়তে আকাশ দেখতো, মিত্তিরদের বাড়ীর দুষ্টু ছেলেটা লেখাপড়া না করে ঘুড়ি ওড়াতো, নানা রং-বেরং-এর ঘুড়ি, অলকের মাঝে মাঝে লোভ হতো বৈকি! আর নিজে ওড়াতে পেতো না বলে টেবিল থেকে মুখ তুলে ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, 'দুয়ো পেটকাটা', ঐ যা সতরঞ্চি, ময়ূরপঙ্খী ভো কাট্টা হয়ে গেল, ছেলেটা এ সব শুনে দাঁত কিড়মিড় করে উঠতো—লাটাই তুলে ভয় দেখাতো। এসব কাণ্ড মার নজরে পড়লে বকুনি খেতে হবে মনে করে, অলক চুপি চুপি কাজ সারতো। সেই খোলা জানালার খড়খড়িতে এসে পাখীটা একদিন বসলো। অলক মহাখুশী হয়ে ধরতে গেল—সেও উড়ে যাবার চেষ্ট করলো না বিশেষ। তাকে টরেই তখুনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে বাচ্চা উড়িয়া চাকর সটুরাকে দিয়ে খাঁচা আনিয়ে--মাকে জিজ্ঞাসা করে ওর খাবার-দাবার ব্যবস্থা করে সে এক পর্ব বাধিয়ে বসলো। সেদিন পড়ার দফা শেষ, স্কুল যেতে দেরি হলো—এমনি কাণ্ড।

স্কুলে যাবার সময় সটুরাকে বারে বারে বলে গেল—"দেখ, আমার পাখুর গায়ে যেন রোদ না লাগে, জল দিও, খাবার দিও ওর বাটিতে।''

অলক তাকে কত আদরই না করে, পাখু সোনা পক্ষীরাজ। মা বললেন ঃ পক্ষীরাজ কি রে? ওর একটা নাম দে। অলক বললে ঃ তবে? আচ্ছা 'টুনটুনি' নাম থাক, ওর মতে মিষ্টি নাম।

এমনি করে টুনটুনি ওদের বাড়ী দিন কাটাতে থাকে।

অলক মাঝে মাঝে ভাবে ঃ ওতো মাকে ভাই বোনকে ছেড়ে এসেছে—ওর কি মন কেমন করে না? জিজ্ঞাসা করলে বলতে তো পারবে না—আর কোথায় ওর বাড়ী তাই বা কে জানে। রাঙাদাদু মাঝে মাঝে গল্প বলে, আর বলে কোনও প্রাণীকে বন্ধ করে রাখতে নেই, ওদের কষ্ট হয়, মনে করো তোমায়



যদি কেউ অমনি করে রাখে···অলক ভাবলো সত্যিই টুনটুনির হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে। মা নেই— ভাই-বোন নেই কাছে—একেবারে একলা—তবে আমি তো ওকে খুব ভালবাসি।

কদিন অলক এই সব ভাবছিল।

পড়বার টেবিলের কাছেই খাঁচায় টুনটুনি থাকে—মাঝে মাঝে মিষ্টি সুরে ডাকে - অলকের মনে হয় ও তার মাকে ডাকছে। অলক বই থেকে মুখ তুলে বলে কি হয়েছে, টুনটুনি, কি চাও ?

টুনটুনি উত্তর দেয় না।

অলক এমনি করে রোজই কত কথা জিজ্ঞেস করে। এমনি করে টুনটুনির জন্যে ভেবে ভেবে অলকের ধারণা হয়ে গেল টুনটুনির খুব কষ্ট হচ্ছে—আপনজনদের ছেড়ে এসে।

সেদিন রাত্রে অলক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো—কোথায় যেন সে বেড়াতে গেছে একটা মস্ত বাগান—সেই বাগানে কেবল পাখী। ছোট-বড় লাল নীল সবুজ পাঁচ-মিশেলী নানা রংএর নানা রকমের সুন্দর সুন্দর পাখী। গাছ ভরতি, মাঠ ভরতি কেবল পাখী। বাবা পাখী, মা পাখী, ছোট বড় কেবল পাখী আর পাখী। একটাও মানুষ নেই।

একটা গাছের নীচে অলক দাঁড়িয়ে ছিল। গাছের ওপর একট পাখী পরিবার ছিল! তার মধ্যে একটা বাচ্চা পাখী মাকে জিজ্ঞাসা করছে—হ্যাঁ মা, দাদা তো এলো না, কতদিন হলো গেছে, আসবে না মা ?

মা দুঃখিত হয়ে বললে ঃ কোথায় যে গেল, কি করে বলবো। কত খুঁজছি, কত বলেছি, কিন্তু কোথায় যে গিয়ে পড়লো কিছুতেই খোঁজ পাচ্ছি না।

তা'হলে কি হবে মা ? আর একটা বাচ্চা পাখী মাকে জিজ্ঞাসা করলো।

মার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো, ডানা তুলে জল মুছে বললে ; যদি মানুষের কাছে গিয়ে থাকে, তা'হলে আর কি রক্ষে আছে, খাঁচায় রাখবে—ইচ্ছে মতো খাবার দেবে—কখনও কখনও চান করাবে—একটুকুও খোলা বাতাসে উড়তে পারে না। গাছের ডালে বসতে পাবে না। ওরা কেবল বলবে, 'গান কর, কথা শেখ'। এমনি বন্ধ অবস্থায় কি আমরা থাকতে পারি ? ঠিকমতো না থাকতে পেলে গায়ে আমাদের পোকা হয়, এ সব কে দেখবে। ওরা কেবল খাঁচায় বন্ধ করে রাখবে। বাছা যদি ইচ্ছেও করে আসতে পাবে না। আমাদের মত তারও নিশ্চয় মন কেমন করছে। আপনজন ছেড়ে থাকতে কি কেউ চায় ?

ছোট ভাই বললে ঃ মানুষগুলো বড় নিষ্ঠুর—না মা ?

মা বললে ঃ ওরা পাখী পুষতে ভালবাসে, মনের দিকে চায় না। নীল আকাশে উড়তে না পেলে মরে যাব যে আমরা।

অলকের ঘুম ভেঙে গেল—চোখ চেয়ে দেখলো সে মার পাশে শুয়ে আছে। মা তার মাথায় হাত দিয়ে আছেন।

সকালবেলা ঘুম ভেঙেই অলক খাঁচার কাছে গিয়ে বললেঃ তোমার খুব মন কেমন করছে টুনটুনি—মা ভাইদের জন্যে ?

টুনটুনি কিছুই বললে না। খাঁচার ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। অলক আস্তে আস্তে খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বললেঃ তুমি চলে যাও পাখু—তোমার মা-ভাইবোনদের কাছে যাও! তারা তোমার জন্যে খুব ভাবছে, আর কাঁদছে। যাও চলে যাও। তাদের কিন্তু বলো যে অলক আমায় খুব ভালবাসতো, একটুও কষ্ট দেয়নি।

টুনটুনি খাঁচার দরজা খোলা পেয়েও উড়তে চেষ্টা করলো না, তেমনি স্থির হয়ে অলকের কথা শুনতে লাগলো।

অলকের চোখ দুটো ছলছলকরে উঠলো—তারপর আস্তে আস্তে খাঁচা থেকে টুনটুনিকে বার করে এনে—গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেঃ যাও টুনটুন মার কাছে চলে যাও। আবার যদি কখনও আসো এখানে এসো।

টুনটুনি কিছু বুঝলো না—জানলার উপর উড়ে বসলো। তারপর অলক পড়তে বসলো। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে দেখে টুনটুনি দু'বার ডেকে উঠলো।

এমনি সময় সটুরা এসে বললেঃ পা তোলো গো দাদাবাবু, ঘর ঝাঁট দিই। হেই মা, তোমার খাঁচার দরজা খোলা—ঐ দেখ পাখীটা জানালার উপর গিয়ে বসেছে। একথা বলে সটুরা তাকে ধরতে যেতেই—টুনটুন সামনের প্রকাণ্ড চারতোলা বাড়ীর কার্নিসে উড়ে গিয়ে বসলো।

সটুরা আবার বললেঃ হেই দাদাবাবু, তোমার পাখু কোথায় গেল।

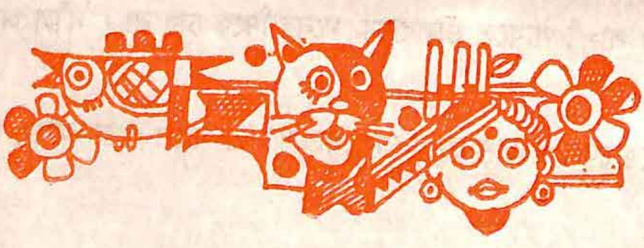
অলক কোন কথার উত্তর না দিয়ে উঠে চলে গেল। স্কুলে যাবার সময় অলক আবার তাকিয়ে দেখলো টুনটুনি তখনও কার্নিসে বসে আছে—অলককে সেও দেখছে। তাই অলক তার দিকে যখন তাকালো সেও দু'বার ডেকে উঠলো।

যতটুকু দেখা যায়—ফিরে ফিরে টুনটুনিকে দেখতে দেখতে অলক স্কুলে চলে গেল।

বিকেলে বাড়ী ফিরে অলক সামনের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখলো জায়গাটা খালি।

নিজের টেবিলের কাছে বসে জলভরা চোখে অলক টুনটুনির খালি খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে রইল। মা খাবার দিতে এসে আদর করে বললেনঃ টুনটুনি ওর মার কাছে থাক তুমি তো তাই চেয়েছিলে অলু, তবে কাঁদছো কেন ?

মার কোলে মুখ লুকিয়ে অলক বললেঃ ওর জন্য বড় মন কেমন করছে মা।



প্যাঁক  প্যাঁক

বাড়ীর পিছনের জমিটা নীচু থাকায় একটু বৃষ্টি পড়লেই ডুবো জমি হয়ে যেতো। প্রায় বারোমাসই একই হাল। ববিদের বাড়ীর পোষা হাঁসগিন্নি সপরিবারে সেখানে দিনের প্রায় সমস্ত সময়টা কাটাতো। জলা জমির আশেপাশে তাদের অনেক খাবার। ববিদের বাড়ীর বরাদ্দ খাবার অনেক কমে গেছে আবার ওর সংসার বেড়েছে। আবার ওদের বাড়ীর কাজের লোক মানদা রুটী জলে ভিজিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। প্রথম যেদিন এই খাবার দেওয়া হলো সেদিন জলে বসে বসে হাঁসগিন্নি প্রায় সারাদিন ধরে চেঁচিয়েছে—প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক। কর্তা আর ছেলেমেয়ের দল প্রথম দিকে ছুটে এলো ঃ কি ? কি হয়েছে ? হয়েছে কি ? বাচ্চাগুলোও তিড়বিড় করে এসে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—

গিন্নি আরো জোরে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো ঃ—এই খেয়ে আমার ছেলেপুলে বাঁচবে কি করে ? কর্তা নিরুত্তর।

গিন্নি আবার চীৎকার করে বললে ঃ বলি কানে কি কথা যায় না ? এদিক ওদিক ডোবা পুকুরপাড় কিছু নেই কি, নড়ে চড়ে দেখবে তো !

কর্তা বললে ঃ রাগ হলে তো তোমার জ্ঞান থাকে না। এই এলাকা ছেড়ে যাবার উপায় কি ? সেই সেবার মরতে মরতে রক্ষে পেলাম। চৌধুরীদের ছেলেটা আমায় কোলে তুলে নিয়ে চলেছিল আর কি। ভাগ্যি রবির কাকা পথে বেরিয়েছিল ছেলেটাকে বকে ঝকে আমায় নিয়ে এলো। সকাল দশটার মধ্যে ওদিক সারতে হয়—না হলে বিপদের ঝুঁকি নেবে কি করে ?

হাঁসগিন্নি তখনও গজ গজ করছে।

কর্তা আবার বললে ঃ রাগ করে কি করবে বল ? সবতো র‍্যাশান—বুঝে চলতে হবে তো !

হাঁসগিন্নি প্যাঁক প্যাঁকানি আবার চরমে উঠলো ঃ হ্যাঁ সব বুঝি, নিজেরা ভাল ভাল খাচ্ছে না। কেবল আমার ছেলেপুলে আর আমাদের খেতে দিতে হলে ববির ঠাকুমা বা ওদের গুষ্টিশুদ্ধর কষ্ট হয়। কেবল ডিম চাই—না ? বাড়ীতে লোক এলেই ঠাকুমার গলা পাওয়া যাবে—'ওরে মানদা, দেখতো হাঁসের ঘরে ডিম আছে কিনা।'

—কিন্তু মানদা তো সব সময় আসে না। কর্তা বলে—আসে না ঠিক, কিন্তু ঠাকুমা সব সময় চোখ



দিয়ে আছে, 'মানদা, ও তোমার কি বিবেচনা। এই আক্রা গণ্ডার দিনে একথালা ভাল হাঁসবুরে দিয়ে দিলে ? পরের ভাত কিনা। অবিশ্যি মানদা বলছিল ঃ না গো মা, আমার গা কেমন করলো, খেতে পারলাম না বলে ওদের ঢেলে দিয়েছি। তাইতো বলছি খাবার যোগাড় এই মাঠ ঘাট থেকে করতে হবে – তাও আবার সব অফিস ইস্কুল যাবার আগে। মানে বাড়ী খালি হবার আগে। হাঁসকর্তা যত থামাতে চায়—হাঁসগিন্নির মেজাজ আরো চড়ে যায়।

পাশেই মুরগী মাসীর ঘর। তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তাদের দিকে তাকিয়ে হাঁসগিন্নি আবার বলে ওঠে ঃ ববির ঠাকুমা কি বলে জানো ? বলে কিনা মুরগীগুলো খায় কম আর ডিম দেয় বেশী। হাঁসগুলো খাবার কুটুম।

ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বলে উঠলো ঃ একদিন দেবো নাকি ববির ঠাকুমাকে কামড়ে ? ঠোঁট ফোটালে বুঝবে কেমন মজা।

কর্তা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ঃ না না কামড়াবি কেন ? র‍্যাশান কুলোয় না তাই বলে—আর মুরগী মাসীর ঘরে—

— চুপ করো, মুরগী মাসীর ঘরে ডিম পায় তাই—কি বলছিল মুরগীমাসী জানো ? দুঃখে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল—বললে ঃ দিদি কি বলবো, ডিমগুলো তুলে নিয়ে যায়, বাচ্চা হতে দেয় না। মানদাকে তোমরা ভালো বলো, ওর মত পাজী মেয়ে আর আছে। সেদিন সারাদিন একটা পিঁয়াজ খাইয়ে রাখলে। ববির ঠাকুমা কেবল চেঁচাবে—বলবে ঃ ডিম থাকলে নিয়ে এসো মানদা, দুধ দিয়ে ববিকে খাওয়াতে হবে।

হাঁসকর্তা একটু দূরে সরে গিয়ে মেয়েলী গল্প আর নিন্দা শুনছিল। একটুও ভাল লাগে না ওর, গেরস্থ বাড়ী বাস করি, তাদের ভালো মন্দে মিশে থাকতে হবে তা নয় কেবল নিন্দে। যতসব নিন্দুক মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করতে হয় ছিঃ। তারচেয়ে সারাদিন ঐ ডোবায় গলা ডুবিয়ে বসে থাকা ভালো।

হাঁসকর্তা বিরক্ত মুখে ভাবছে—এমন সময় পাশের বাড়ী থেকে পল্টন চেঁচিয়ে বলে উঠলো ববির মাকে—'ও মাসী, তোমাদের হাঁসগুলো আমাদের রান্না ঘরে গিয়ে সব তাতে মুখ দিচ্ছে।

ববির মা জানলা দিয়ে মুখ ঝুলিয়ে বললে ঃ তাড়িয়ে দাও ঐ ডোবায় চলে যাবে।

পল্টন বললে এতদিন রান্নাঘরের পিছনে সব খুঁটে খুঁটে খেতো, এখন বাচ্চাগুলোর আর ভয়ডর নেই গো মাসী, একেবারে রান্নাঘরে ঢুকেছে, আমার ঠাকুমা কী ভীষণ রেগে গেছেন।

হাঁসকর্তা ভাবলো ; সব বাড়ীর ঠাকুমাদের কি হাঁসেদের উপর রাগ ? তবে হ্যাঁ, ছেলেমেয়েগুলো বড্ড বেয়াদপ হয়েছে। পরের ঘরে ঢুকে খাওয়া কি অভ্যাস ? আমরা যখন ছোট ছিলাম, মা বলে দিয়েছিল—ছিঁচকে চুরি করবে না, যা দেবে তাই খাবে, আর পুকুর পাড় বা ঘাস থেকে যা পাও খেও। আমাদের সময়ই আলাদা গেরস্থ বাড়ী থেকে যা দিত খেতে তাতেই যথেষ্ট ছিল।

আবার পাশের বাড়ী থেকে চীৎকার শোনা গেল ঃ —ও ববি তোমাদের হাঁস আমার বোনের পায়ে

কামড়ে দিয়েছে। ইস্ রক্ত পড়ছে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। কর্তা দেখলো মিমির-দাদা একটা লাঠি নিয়ে বাচ্চাদের তাড়া করছে।

সব বাড়ীর গিন্নিদের কলরব পড়ে গেল ঃ হাঁসগুলো কি বদমাইস হয়েছে। বোসগিন্নি তেড়ে এলেন এ বাড়ীতে—ববির ঠাকুমা প্রায় নিরুদ্দেশ ঘরের ঘুপচিতে। রোজ রোজ এই হাঁস পর্ব সহ্য হয় না, ববি ভালবাসে বলেই না ওদের রাখা।

হাঁসগিন্নিও কি সহজে ছাড়বার পাত্রী? বাচ্চাদের পরামর্শ দিয়েই চলেছে—জোর করে খাবি। এ যুগ হচ্ছে জোর যার মুলুক তার শুনিস না? কেড়ে কুড়ে ভয় দেখিয়ে—যেমন করে পারিস খাবি।

কর্তার এসব ভালো লাগে না। ভাবে ঃ ববিদের বাড়ী ভালই আছি সব, যা দেয় খেয়ে ডোবায় চান করে গলা ডুবিয়ে, যদি কিছু খুঁটে খাবার থাকে তা খেয়ে বেশ আছি—থাকবোও। ছেলে মেয়েদের কি সব বাজে পরামর্শ দেওয়া যে গিন্নির।

—প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক শুনছো, বলি ধ্যান করছো নাকি? অহঙ্কারে গলা ফুলিয়ে হাঁসগিন্নি বলে উঠলো।

—কি বলছো বল!

হাঁসগিন্নি পাখার ঝাপটায় গায়ের জল ঝাড়তে লাগলো, আর মুক্তোর মত ছোট ছোট দানায় জলগুলো ঝরে ঝরে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

জানলায় দাঁড়িয়ে ববি দেখছিল। হাঁসদের ও খুব ভালবাসে, কেমন পাখা উঁচু করে কানে কানে একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলে—তারপর একসঙ্গে দুলকি চালে ওরা যায়। জলে নেমেও কেমন খেলা।

ববি দেখে আর দেখে।

এমন সময় ওর বন্ধু মিণ্টু এসে পড়ে। বাস, তারপর হাঁস মুরগী নিয়ে খেলা শুরু হয়। এর মধ্যে ঠাকুমার গলা শোনা যায়—ও ববি, ও মিণ্টু খবরদার হাঁসের কাছে যেও না, ওপর থেকে দেখো। ওরা ভীষণ পাজী, পা কামড়ে দেবে, তেড়ে আসবে।

কথাগুলো শুনতে পায় বৈকি, হাঁসগিন্নি স-পরিবারে। গিন্নি রেগে পাখার ঝাপটা দিয়ে কর্তাকে ব'লে ওঠে ঃ বলি শুনছো না ধ্যান করছো? এত অপমান অন্যবাড়ীর ছেলেপুলের কাছে।

প্যাঁক, প্যাঁকা প্যাঁক—ওমা, ববির বন্ধু মিণ্টু এই রুটীর টুকরোগুলো দিয়েছে খেতে—বাচ্চাগুলো কোরাসে বলে ওঠে। হাঁসগিন্নি খান খান হয়ে ফেটে পড়ে—বলে ঃ ঐ ভিক্ষার জিনিস তোরা খা। শুনেছিস তোদের নিন্দের কথা ববির ঠাকুমার মুখে?

খাবার নিয়ে চারজনে কাড়াকাড়ি করছে তখন কে শুনছে কার কথা।

হাঁসকর্তা বলে উঠল ; ঐজন্য তোমায় সব্বাই বলে অহংকারী। আর যায় কোথায়—রেগে গিয়ে ডোবার এদিক থেকে ওদিক ছুটোছুটী করতে লাগলো হাঁসগিন্নি। আর চীৎকারে অস্থির করতে লাগলো।

খিড়কী দরজা খুলে মানদা দেখতে এলো—কেউ মারছে না কি? এত চেঁচান কিসের?

মুরগী মাসী তার বাচ্চা-কাচ্চা সব বেরিয়ে এলো। মানদা গিয়ে গলা ধরেধরে সবগুলোকে জাল দেওয়া কাঠের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। রেগে গিয়ে আপন মনে গজ গজ করে বলতে লাগলো; তোদের নিয়ে এত অশান্তি আর সহ্য হয় না। দিচ্ছি দূর করে। বলা শেষ হবার আগেই হাঁসগিন্নি লম্বা ঠোঁট দিয়ে মানদার পায়ে এমন কামড়ালো যে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

—উঃ। বলে পা'টা ধরে চলে আসতে আসতে মানদা বললে ঃ পরের মন্দ করতে গেলে, নিজের মন্দ আগে হয়' সেটা বুঝবে দাঁড়াও।

পরের দিন সকালে মানদার পা দেখতে ডাক্তার এলেন আর এলো মস্ত ঝুড়ি মাথায় বিক্রিওয়ালা।

হ্যাঁ, সপরিবারে হাঁস পরিবার ঝুড়িতে উঠে চলে গেল। কোথায়?

কে জানে কোথায় যাবে তারা। কোথাও হয়তো ফিস্ট আছে।

এখন ববিদের বাড়ী এসেছে পাখী? মুনিয়ার ঝাঁক, টিয়া, ময়না, ছোট্ট ছোট্ট রঙীন পাখী—ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ে আবার বসে।

মুনিয়ারা গান গায় রিনটিন, রিনটিন করে—। ববি, বণি, মিন্টু, পাপু ও মোম চুপ করে বসে শোনে।



এমনি আরো বই রয়েছে
মজার এবং খুশির,
বই রয়েছে হালুম বাঘের,
মিঁ আঁও মিনি পুষির।



লিখলে চিঠি বই-তালিকা
পৌঁছে যাবে ডাকে।
যার মধ্যে নিত্য নতুন
বইয়ের খবর থাকে॥

আমাদের জনপ্রিয় শিশু ও

প্রফুল্ল রায়
- পাগল মামার চার ছেলে — ১২ ০০
- সেনাপতি নিরুদ্দেশ — ১০ ০০
- তিন মূর্তির কীর্তি — ১২ ০০

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন
- ক্রিসেন্ট পাহাড়ের নরখাদক — ১৫ ০০

নরমান কার
- কাফুর সিংহ — ১০ ০০
(ভাষান্তর : পরিতোষ মজুমদার)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- জুলভের্নের গল্প — ১০ ০০
- পৃথিবী কী করে বাঁচলো — ১০ ০০

জেকব দুই দুই আর ফণাধর
- দস্তু পাটি মুখোমুখি — ৬ ০০
- মিডনাইট (র‍্যানডলফ স্টো) — ১০ ০০
- ঘন্টা বাজে দূরে — ২০ ০০
(হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের জীবনী)

শ্রাবন্তী ঘোষ
- চিকি আর নদী — ৬ ০০

লীলা মজুমদার
- কিশোর বিচিত্রা — ২০ ০০
- লীলা মজুমদারের ছোটদের সমগ্র নাটক — ২০ ০০

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
- মিঠুয়ার বন্ধু ডলফিন — ৬ ০০

সুবোধকুমার দাশগুপ্ত
- চৌধুরী বাড়ির চৌহদ্দি — ১২ ০০

গিরিধারী কুণ্ডু
- দুষ্টু টুসটুসি — ৮ ০০
- বুলাই — ৬ ০০

মানসী বড়ুয়া
- সাগর পারের রূপকথা — ১২ ০০
(বি-বি-সি দে'জ-এর যৌথ উদ্যোগে)

শৈলেন ঘোষ
- হো-বুড়োর খুদে বন্ধু — ১০ ০০
- পিরামিডের দেশে — ১০ ০০

রনাল্ড সেগাল
- টোকোলোশ — ১০ ০০
অনুঃ সুবীর রায়চৌধুরী

আনন্দ বাগচী
- ভূতরহস্য — ১০ ০০

কিন্নর রায়
- আলেকজাণ্ডারের বর্শা — ৮ ০০

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
- কর্পূরের মতো — ৮ ০০

পরিচয় গুপ্ত
- দৈত্য যখন ভয়ঙ্কর — ৩০ ০০
- ভৌতিক শিকার কাহিনী — ৭ ০০
- আষাঢ়ে ভূতের গল্প — ১৫ ০০
- ভূত যখন পুত — ৫ ০০
- মানুষ যখন ভয়ঙ্কর — ৭ ০০
- মরণের মুখোমুখি — ৭ ০০
- ছায়ামূর্তি — ৬ ০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
- ছড়ায় মোড়া কলকাতা — ১০ ০০
- কলকাতার প্রথম — ১২ ০০
- ওদের চোখে মোদের ভারত — ১২ ০০
- হাসতে হাসতে খুন — ১২ ০০

শৈবাল চক্রবর্তী
- পথিক রাজপুত্র — ১০ ০০

কার্তিক ঘোষ
- পাগলা বাঁশি — ৫ ০০

ডাঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত সম্পাদিত
- বনফুল কিশোর সমগ্র (১ম) — ৩২ ০০
- (২য়) — ৩০ ০০

সুবীর রায়চৌধুরী
- মেলা থেকে ঝামেলা — ৭ ০০
- গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা — ৭ ০০

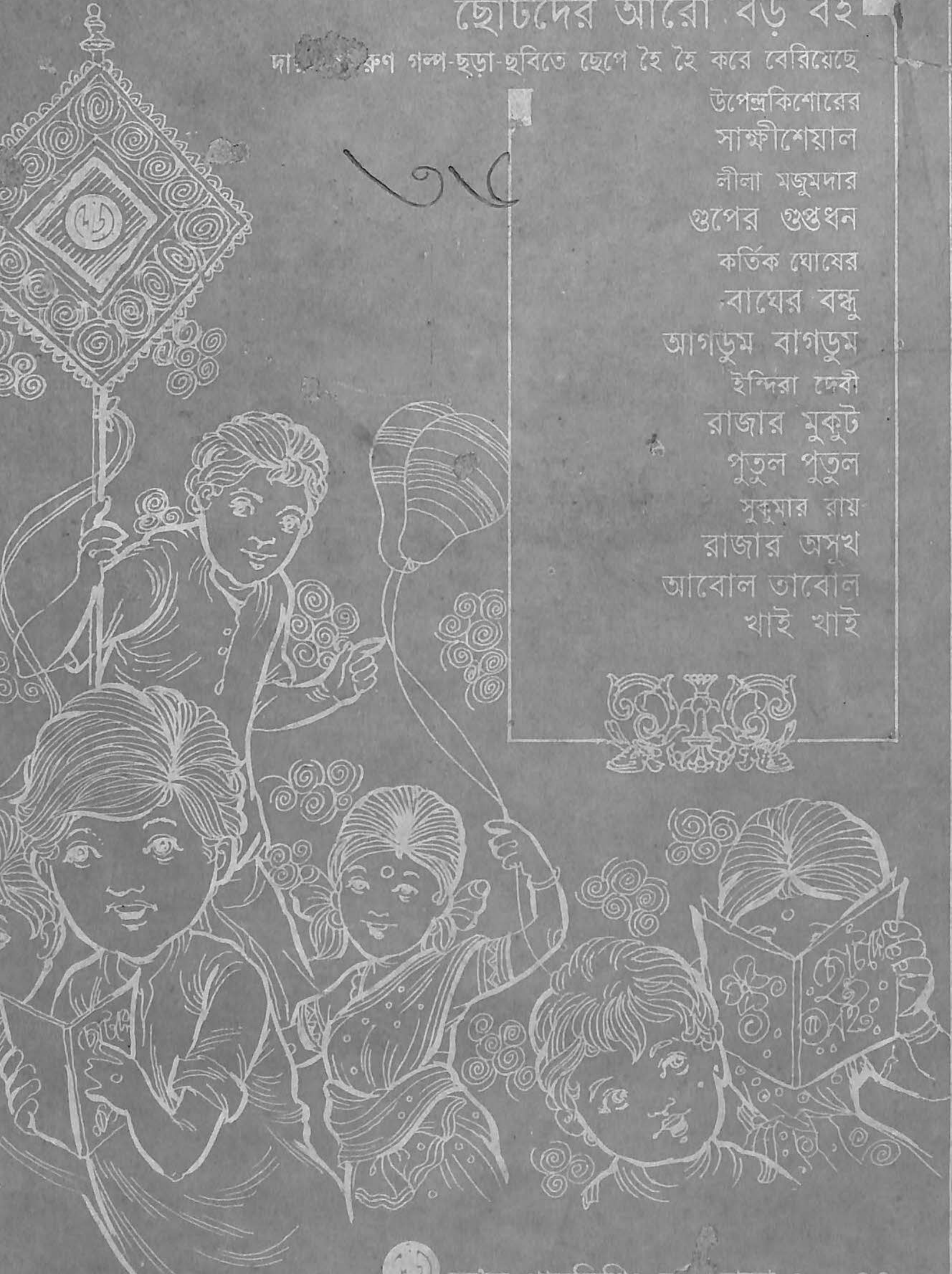
দে'জ পাবলিশিং ক

ও কিশোর সাহিত্য

অর্ধেন্দু দত্ত	
শিকারের গপ্পো	১০ ০০
শংকর	
এক ব্যাগ শংকর	১২ ০০
চিরকালের উপকথা	১২ ০০
নারায়ণ সান্যাল	
ডিজনেল্যাণ্ড	২৫ ০০
না-মানুষের পাঁচালী	১২ ০০
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	
হাতি ধরিয়ে নায়ার	১০ ০০
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	
হ্যানস্ অ্যাণ্ডার সনের গল্প	১৫ ০০
কিশোর সম্ভার	৩০ ০০
গড়জঙ্গলের কাহিনী	১৫ ০০
ছোটদের বেতালের গল্প	১২ ০০
পাতাল পুরীর কাহিনী	১২ ০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	
জঙ্গলের চাবি	২০ ০০
আকাশ দস্যু	[illegible]
বরণীয় মানুষ :	
স্মরণীয় বিচার	১৫ ০০
অনিলকুমার চক্রবর্তী	
ছোটদের রাজমালা	১২ ০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	
পিন্টিদার পঞ্চবান	১৮ ০০
লিডার বটে পিনডিদা	১২ ০০
পিনডিদার গপ্পো	১০ ০০
সিকেপিকেটিকে	১৫ ০০
ফয়সালা	১২ ০০
ইন্দিরা দেবী	
বুনুর অসুখ	৮ ০০
গল্প বলছি ইন্দিরাদি	১০ ০০

ফণিভূষণ আচার্য	
সোনার সুটকেস	৬ ০০
ধর্মদাস মিত্র	
মাষ্টারমশাই	৬ ০০
সৈয়দ মুজতবা সিরাজ	
রহস্য রোমাঞ্চ	১২ ০০
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস	৩২ ০০
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর	১৪ ০০
হাট্টিম রহস্য	১২ ০০
কালোমানুষ নীল চোখ	১৬ ০০
কালো বাকসের রহস্য	১০ ০০
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ	৮ ০০
বনের আসর	১০ ০০
ভয়-ভুতুরে	৬ ০০
নিঝুম রাতের আতঙ্ক	৭ ০০
টেরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর	৭ ০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	
দুনিয়ার ঘনাদা	১৫ ০০
পিঁপড়ে পুরান	১০ ০০
পাতালে পাঁচবছর	১৫ ০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
অক্ষরে অক্ষরে	৮ ০০
কথার কথা	[illegible]
পার্থ চট্টোপাধ্যায়	
রাশি রাশি হাসি	১৫ ০০
ভূত অদ্ভুত	৮ ০০
বাজপাখির চোখ	১২ ০০
শঙ্খ ঘোষের ছড়া	
গনেশ পাইনের ছবি	
সব কিছুতেই খেলনা হয়	১০ ০০
হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়	
হলুদ আতঙ্ক	৮ ০০
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ডোরাকাটার খোঁজে	১৪ ০০
সুন্দর বনের আতঙ্ক	১৫ ০০
বাকলার জঙ্গলে	১০ ০০
শিকারের বিচিত্র কাহিনী	২০ ০০
বাঘ বাঘিনী	১৫ ০০
সুনির্মল বসু	
জীবন্ত কঙ্কাল	১৫ ০০
ছোটদের বিদ্যাসাগর	৭ ০০

কাতা ৭০০০৭৩



ছোটদের আরো বড় বই

দারুণ গল্প-ছড়া-ছবিতে ছেপে হৈ হৈ করে বেরিয়েছে

উপেন্দ্রকিশোরের
সাক্ষীশেয়াল

লীলা মজুমদার
গুপের গুপ্তধন

কর্তিক ঘোষের
বাঘের বন্ধু
আগডুম বাগডুম

ইন্দিরা দেবী
রাজার মুকুট
পুতুল পুতুল

সুকুমার রায়
রাজার অসুখ
আবোল তাবোল
খাই খাই

দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩